প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস

উপাচার্য

পরিচিতি

বিষয় ঃ শিক্ষা **স্নাতকোত্তর স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায়

PG Education : 06 : 1 & 2

	রচনা	**সম্পাদনা**
একক 1–5	ড. সুবীর নাগ	অধ্যাপক পি. কে. চক্রবর্তী
একক 6–10	ড. মধুমালা সেনগুপ্ত	অধ্যাপক প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড:) বিকাশ ঘোষ
নিবন্ধক (কার্যনির্বাহী)

তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, 2011

ভারত সরকারের দূর শিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance
of the Distance Education Council, Government of India.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG Education : 06

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

পর্যায়
1

একক 1	❑	শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি	1 — 16
একক 2	❑	শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্ব	17 — 31
একক 3	❑	সংস্থার ধারণা	32 — 48
একক 4	❑	শিক্ষার আর্থিক প্রসঙ্গ	49 — 60
একক 5	❑	পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান	61 — 69

পর্যায়
2

একক 6	❑	শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	70-80
একক 7	❑	শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব	81-95
একক 8	❑	শিক্ষামূলক পরিকল্পনা	96-107
একক 9	❑	নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	108-118
একক 10	❑	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকাশ	119-127

একক ১ ❑ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি
(Nature and Scope of Educational Administration)

গঠন (Structure)

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি

১.৩.১ শিক্ষা প্রশাসন

১.৩.২ শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য

১.৩.৩ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি

১.৩.৪ শিক্ষা প্রশাসনের কার্যনীতি

১.৪ শিক্ষা প্রশাসনের সংস্থা

১.৫ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা

১.৫.১ কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

১.৫.২ রাজ্য সরকারের ভূমিকা

১.৫.৩ স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থার ভূমিকা

১.৬ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) ও রামমূর্তি কমিটির মতামত

১.৭ সারসংক্ষেপ

১.৮ প্রশ্নাবলি

১.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই শিক্ষা একটি বিপুল কর্মযজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃত। শিক্ষার নীতি নির্ধারণ, পাঠক্রম রচনা, পাঠক্রমের সফল প্রয়োগ, মূল্যায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, অর্থনৈতিক সংস্থান

এইসব কিছুকে সঠিক ভাবে সচল রাখার প্রক্রিয়ার যে-কোনো একটি ব্যাহত হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, যা শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের প্রধানতম হাতিয়ার। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকশিক্ষিকা, অভিভাবক, পুস্তক রচয়িতা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরে কর্মরত ব্যক্তিরা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মীরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষাযন্ত্রকে সচল রাখার অন্যতম অংশীদার। শিক্ষাকে সচল রাখার অর্থ শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় বজায় রেখে, তাৎক্ষণিক লক্ষ্য পূরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য পূরণের দিকে অগ্রসর হওয়া। এখানেই শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্ব সর্বাধিক।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা প্রশাসনের ধারণা দিতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) ও রামমূর্তি কমিটির মতামত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে পারবেন।

১.৩ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি সামগ্রিকভাবে উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। এখানে প্রথমে শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিয়ে তারপর এর প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তবে যেহেতু শিক্ষা প্রশাসন একটি ফলিতবিদ্যা সেহেতু অন্যান্য তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর চেয়ে প্রশাসনিক লক্ষ্য ও কার্যনীতিগুলি উল্লেখ করা হল। এর প্রথমটি শিক্ষা

প্রশাসনের ধারণাকে স্পষ্ট করবে এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কার্যনীতিগুলি শিক্ষা প্রশাসনের পরিধি সম্বন্ধে ধারণা দান করবে।

১.৩.১ শিক্ষা প্রশাসন (Educational Administration)

শিক্ষা বলতে আমরা একজন শিক্ষার্থীর জীবনের পূর্ণবিকাশকে বুঝিয়ে থাকি, অর্থাৎ বৌদ্ধিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক এবং দৈহিক বিকাশের পূর্ণতা অর্জন করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষা প্রশাসন বলতে এমন একপ্রকার সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যার প্রয়োগের মাধ্যমে যে-কোনো শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষাতন্ত্র তার উদ্দেশ্যপূরণের দিকে মসৃণভাবে চলতে পারে। একেই কোনো শিক্ষা সংগঠনের মূল চালিকা শক্তি বলেও অভিহিত করা যায়। প্রকৃত সামাজিক উন্নতি-ই শিক্ষা প্রশাসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

১.৩.২ শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য (Primary Aims of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশাসনের ধারণা সঠিকভাবে পরিস্ফুট করতে হলে, এর লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে জানা দরকার। লক্ষ্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

(১) প্রশাসন সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা ও তাকে যথাযথভাবে কার্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করা।

(২) বিভিন্ন ধরনের সময়সীমা অনুসারে প্রকল্প নির্ধারণ এবং তার যথাযথ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বাধা দূর করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করা।

(৩) বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন এবং কর্তৃত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া।

(৪) সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তির যে-কোনো উদ্ভাবনী প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া।

(৫) কর্মীদের কর্মক্ষমতা ও প্রাপ্ত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে উপযুক্ত লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হওয়া।

(৬) প্রশাসনের সর্বস্তরের কর্মীদের এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় সহযোগিতা, আস্থা ও শুভেচ্ছা অর্জন করতে পারা এবং গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।

১.৩.৩ শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি (Nature of Educational Administration)

যে-কোনো সমাজের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে মানবসম্পদের সঠিক চিহ্নিতকরণ, যথাযথ বিকাশে সাহায্য করা, প্রকৃত মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি এই সম্পদের সঠিক ব্যবহারের ওপর। শিক্ষা প্রশাসন প্রধানত এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষা প্রশাসন হল শিক্ষা ব্যবস্থাপনার

একটি কার্যকরী দিক। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি পূরণ করার পদ্ধতি হল শিক্ষা প্রশাসন। কোনো কোনো তাত্ত্বিক মনে করেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বা Educational Management যদি দেহ হয় তবে, শিক্ষা প্রশাসন বা Educational Administration হল তার মস্তিষ্ক স্বরূপ। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের মূল পার্থক্য এই যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সাধারণ বাণিজ্যিক লাভক্ষতির প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অথচ শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রটি প্রধানত বিবেচিত হয়। শিক্ষাবিদ Siars শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে তত্ত্বগুলি আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে শিক্ষার মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে নীতি প্রণয়ন করতে হয়। এই নীতি অনুসারেই কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যার সঙ্গে অন্যান্য প্রত্যক্ষ বিষয়গুলির কথা বিবেচনা করতে হয়। যেমন—প্রয়োজনীয় অর্থ, উপযুক্ত মানবসম্পদ ও বিভিন্ন দ্রব্যাদির সুযোগসুবিধা। সঠিক মূল্যায়নের সাহায্যে শিক্ষা প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হচ্ছে তার পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার একটি মূল দায়িত্ব যা শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য সাধনে সাহায্য করে থাকে।

F. W. Taylor যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার (Scientific management) তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন তাতে উপরিউক্ত নীতি বা পদ্ধতির বাইরেও তিনটি বিষয় বলা হয়েছে—

(i) যে-কোনো স্তরের কর্মের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ii) কাজের সময় ও গতি পর্যালোচনার মাধ্যমে (work study and time study—ILO) যে-কোনো কাজের সঠিক মূল্যায়ন। International Labour Organisation-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে যে-কোনো কাজের প্রশাসনিক দক্ষতার বিষয়টি কাজের সময় ও গতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

(iii) প্রশাসকের সঙ্গে অধস্তন কর্মচারীদের সুস্থ ও সহযোগিতার সম্পর্ক যে-কোনো প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনাকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

Henry Fayol যে, Operational Management Theory বা, কর্মসম্পাদনমূলক ব্যবস্থাপনার মতবাদ উল্লেখ করেছেন তাতে শিক্ষা প্রশাসনের সাফল্যের জন্য কর্মীদের পেশাদারি দক্ষতার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

Max Weber তাঁর Bureaucratic Theory of Management বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মতবাদে পেশাদারি দক্ষতা ছাড়াও শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি গুণাবলির উল্লেখ করেছেন যা যে-কোনো প্রশাসনের সাফল্যলাভের মূল কথা।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে Neo Classical Approach বা নয়া ক্ল্যাসিকাল মতবাদ যে-কোনো প্রশাসনের কর্মীদের দক্ষতার পাশাপাশি উপযুক্ত মানসিকতা গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছে। যার মূল কথাই হল কর্মীদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা (motivation) গড়ে তোলা, যা না থাকলে কোনো ক্ষেত্রেই উৎপাদনী দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে না।

Knezvich এবং Nort শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে যে মূল বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন তা হল—

- নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পূরণ ও মূল্যায়ন।
- ওই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সকল প্রকার পদ্ধতি ও প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করা।
- মানবসম্পদ ও বস্তু সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার, সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে সুসংগঠিত করা এবং সব ধরনের প্রচেষ্টাগুলির মানোন্নয়ন করা।
- উদ্দেশ্য, সংগঠন, নেতৃত্বদান, কর্তৃত্ব এবং দলগত প্রচেষ্টার উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখা।
- পরিকল্পনা, সংযোগ, সমন্বয়, সমস্যার সমাধান এবং মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির যথার্থ সমন্বয়সাধন।

সুতরাং শিক্ষা প্রশাসন একটি ধারাবহিক, গতিশীল, সমন্বয়কারী পরিকল্পিত সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যা সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে। শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে তথা সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

১.৩.৪ শিক্ষা প্রশাসনের কার্যনীতি (Principles of Educational Administration)

এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিক্ষা প্রশাসনের পরিধি সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় এর কার্যনীতিগুলির মাধ্যমে। কারণ প্রকৃত অর্থে শিক্ষা প্রশাসনের পরিধি যতটা বিস্তৃত ততটাই পরিবর্তনশীল। জাতীয়নীতি, সমাজের চাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের পরিধিও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

- শিক্ষা প্রশাসন বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি অনুসারে রাজ্য সরকার তাদের শিক্ষাপ্রকল্প রূপায়ণ করে থাকেন। যার মূল দায়িত্ব পালন করে শিক্ষা প্রশাসন।

- কেন্দ্র, রাজ্য বা স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থার যে-কোনো পরিকল্পনা বা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য আর্থিক অনুদান, মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা শিক্ষা প্রশাসনের মূল দায়িত্ব।
- শিক্ষানীতি অনুসারে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ শিক্ষা প্রশাসনের মূল দায়িত্ব—এর জন্য তিনপ্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে—

  (১) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা—পাঁচ বৎসর বা তার বেশি।

  (২) মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা—দুই বা তিন বৎসর কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম।

  (৩) স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা—এক থেকে দুই বৎসর পর্যন্ত।
- শিক্ষা প্রশাসনের কার্যনীতি অনুসারে উপযুক্ত কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ। কর্মধারাগুলির স্তরবিন্যাস করা শিক্ষা প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।
- কাজের ধরন অনুসারে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী নির্বাচন এবং তাদের যথাযথ উৎসাহ প্রদান করা প্রশাসনিক দায়িত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।
- কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বাধা উপনীত হলে তার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা করা শিক্ষা প্রশাসনের অন্য আর একটি বিশেষ দায়িত্ব।
- কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য বা নীতি কতখানি রূপায়িত হয়েছে তার নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা এবং নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্য ত্রুটি বা বাধাগুলি দূর করা শিক্ষা প্রশাসনের মূল কার্যনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

১.৪ শিক্ষা প্রশাসনের সংস্থা (Agencies of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশানের মূল লক্ষ্যই হল এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংগঠন যেখানে মানবসম্পদ ও বস্তুসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে এমন একটি কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলা, যার দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে। যে-কোনো ধরনের শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করার জন্য উপযুক্তভাবে পরিকল্পনা করা, নীতি নির্ধারণ করা, কর্মপদ্ধতি ঠিক করা এবং সর্বোপরি সামগ্রিকভাবে নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে কতটা উদ্দেশ্য সফল হল তা সঠিক মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর অনুসারে নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা (Agency) বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সরকার দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (diarchy) প্রচলিত করেছিল। তারা শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখেনি। তারা আঞ্চলিক স্বশাসিত সংস্থার হাতে শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। যদিও নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি ছিল গভর্নর জেনারেলের হাতে। আঞ্চলিক সংস্থাগুলি মূলত প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনের দায়িত্ব পালন করত।

স্বাধীনতার পরে শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক হয়। সংবিধানের সপ্তম তপশিলের দ্বিতীয় তালিকার ১১নং ধারা অনুসারে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম তালিকার ৬৩নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যেমন—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ৬৪ নং ধারা অনুসারে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণাকেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হয়। তৃতীয় তালিকার ২৫নং ধারায় বৃত্তিমূলক ও পেশাগত শিক্ষা, ৪৫নং ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা, ২০নং ধারায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা যৌথ তালিকাভুক্ত হয়। ২৮২নং ধারা অনুসারে রাজ্যগুলিকে শিক্ষার উন্নয়নখাতে কেন্দ্রীয় ব্যয়বরাদ্দ থেকে অনুদান মঞ্জুর করার বিষয়টি (Grant-in -aid) উল্লেখ করা হয়।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছাড়াও এই বিশাল দেশের শিক্ষা প্রসারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট্রি বোর্ড, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (Non-Governmental Organisation) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তরের নাম বদল হয়ে হয়েছে 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক'। যার শীর্ষে আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তাঁর সেক্রেটারিয়েট। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটি এই মন্ত্রকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যেমন, University Grants Commission (UGC), National Knowledge Commission, All India Council of Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI), National Council of Teacher Education (NCTE), National Council of Educational Research and Training (NCERT), Central Advisory Board of Education (CABE), National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), Rehabilitation Council of India (RCI) ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি স্তরের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরগুলি একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষা প্রশাসনের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে বড়ো বাধা হল এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্যে

প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান। স্বাধীনতার পর থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা আবশ্যিক করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তাকে আবার নতুন নাম দিয়ে 'সর্বশিক্ষা শিক্ষা অভিযান' রূপে চালু করা হয়েছে। সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন জেলাকে কাগজে কলমে পূর্ণ স্বাক্ষর বলে চিহ্নিত করলেও বাস্তবক্ষেত্রে তা সর্বদা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরগুলির যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হল—

১.৫ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থাগুলির ভূমিকা (Role of Central, State Governments and Local Bodies)

১.৫.১ কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা (Role of Central Government)

সাংবিধানিক কাঠামো অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক বলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিভাগটি শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন উন্নয়ন, বিকাশ, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতার নাম যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করেন। এক নজরে কেন্দ্রীয় সরকারি ভূমিকাগুলি নিম্নরূপ—

● **পরিকল্পনা (Planning) ঃ** রাজ্য বা স্থানীয় স্তরের চাহিদা অনুসারে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ।

● **সংগঠন (Organisation) ঃ** শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণ। যেমন, সর্বশিক্ষা অভিযান, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগ ইত্যাদি।

● **নির্দেশনা (Guidance) ঃ** যে-কোনো নীতির যথাযথ রূপায়ণ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া।

● **নিয়ন্ত্রণ (Control) ঃ** যেহেতু কেন্দ্রীয় অনুদান বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এমনকি রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং সময়সীমা

অনুসারে দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য আর্থিক ব্যয় ও পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য তারা কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়ে থাকে।

● **শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগসুবিধার সমবণ্টন (Even distribution of facilities) ঃ** কেন্দ্রীয় নীতি অনুসারে সারা দেশের কোনো জনসম্প্রদায় যাতে অবহেলিত না হয় এবং সকলেই যাতে সমান সুযোগসুবিধা লাভ করে তা নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য।

● **কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল** বা **রাষ্ট্রপতি শাসনাধীন** রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা।

● **বিভিন্ন প্রকল্পের অনুমোদন** যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, উচ্চতর গবেষণা এমনকি সর্বসাধারণের গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা করতে পারে।

১.৫.২ রাজ্য সরকারের ভূমিকা (Role of State Government)

রাজ্য সরকার মূলত কেন্দ্রীয় সরকারি নীতির প্রয়োগ এবং তার যথাযথ উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কোনো কোনো রাজ্যে শিক্ষাদপ্তর একটি মন্ত্রকের অধীনে হলেও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ আছে। যেমন—প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রক, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক, জনশিক্ষা মন্ত্রক ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রক ইত্যাদি। এটি শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের একটি অত্যন্ত কার্যকরী এবং আধুনিক মডেল যার ফলে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমান নজর দেওয়া সম্ভব হয়। এক নজরে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিম্নরূপ—

● **আইন প্রণয়ন (Legislation) ঃ** বর্তমানে শিক্ষা সংবিধানের যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য কেন্দ্রীয় নীতি ও প্রকল্প ছাড়াও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন শিক্ষার বেশ কিছু ক্ষেত্র যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের আছে। তবে নিয়ম অনুযায়ী কোনো আইন প্রণয়ন করা হলেও তাকে কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন।

● **আর্থিক অনুদান (Financial Grant) ঃ** প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সবটাই এবং উচ্চশিক্ষার বেশ কিছু আর্থিক দায়ভার মূলত রাজ্য সরকারের ওপর বর্তায়। রাজ্য বাজেটের আর্থিক অনুদানের একটি বড়ো অংশই ব্যয় হয় শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্নস্তরের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেনশন ইত্যাদি বাবদ।

● **রাজ্যের চাহিদা অনুসারে পাঠক্রম তৈরি (Curriculum Development as per State level needs) ঃ** ভারতের মতো বিশাল দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক চাহিদা একই রকম না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেক রাজ্যই তাদের নিজস্ব ভাষা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি অনুসারে বিদ্যালয় স্তরে পাঠক্রম রচনা করে থাকে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় একেবারে স্থানীয় স্তরের চাহিদা অনুসারেও কোনো বিশেষ শিক্ষা প্রকল্প নেওয়া হয়।

● **তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন (Supervision and Inspection) ঃ** বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নজরদারি করা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব।

● **শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (Employment of Teaching and Non-teaching staff) ঃ** রাজ্যের বিভিন্ন উপদেষ্টা পর্ষদ যেমন—State Council of Educational Research and Training (SCERT), Council of Higher Education, State Council of Higher Education ইত্যাদি রাজ্য সরকারকে শিক্ষার প্রসার ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও আছে নানা স্তরের শিক্ষা পর্ষৎগুলি। যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষৎ (Board of Primary Education), মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (Board of Secondary Education), উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (Council of Higher Secondary Education), সংখ্যালঘুদের জন্য বোর্ড, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত বোর্ড বা কমিটি ইত্যাদি। উচ্চশিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রধানত স্বশাসিত কিন্তু সরকারি অনুদান নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

১.৫.৩ স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থার ভূমিকা (Role of Local Bodies)

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে শিক্ষার মূল নীতি, পরিকল্পনা এবং আর্থিক দায়দায়িত্ব ও আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা মূলত কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার অধীনে রাজ্য সরকারের হাতে থাকলেও সেই নীতির উপযুক্ত প্রয়োগ করার দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতেই থাকে এবং কোন্ প্রকল্প কতটা বাস্তবায়িত হল সে বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের রাজ্য সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়। ভারতের মতো বিশাল দেশে এইসব স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলতে বিভিন্ন ধরনের সংস্থাকে বোঝায়, যাদের সাধারণত মূল দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) সরকারি সাহায্য বা অনুদান প্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক আধিকারিক, স্থানীয় উদ্যোগে গঠিত ট্রাস্ট বা বিশেষ ধর্মীয় বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

(২) **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** যারা মূলত ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং সরকারি কোনো অনুদান গ্রহণ না করেই সরাসরি উপভোক্তাদের অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ হারে বেতন নিয়ে তাদের পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করে। কিছু কিছু N.G.O., দাতব্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণমূলক ট্রাস্ট বা মিশন, সরকারি অনুদান ছাড়াই জনসাধারণের সাহায্যের বা দানের অর্থে কোনো ব্যাবসায়িক লাভ ছাড়াই তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে।

সাধারণভাবে এদের ভূমিকা নিম্নরূপ—

● রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাগুলি তাদের প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারি নীতির উদ্দেশ্য পালনে সহায়তা করে।

● পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, দৈনন্দিন হাজিরা ও পঠনপাঠন প্রক্রিয়া জারি রাখা এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

● স্থানীয় চাহিদা অনুসারে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি, নানা উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করা, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, জনস্বাক্ষরতা প্রকল্প, মিড ডে মিল ব্যবস্থাকে চালু রাখা, আর্থিক দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সহায়তা দান স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

১.৬ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং রামমূর্তি কমিটির মতামত [Views of NPE (1986) and Rammurthy Committee on Educational Administration]

1986 সালে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়। 1990 সালের 7 নভেম্বর আচার্য রামমূর্তির সভাপতিত্বে 16 জন সদস্যের এক কমিটি 1986 সালের জাতীয় শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এই কমিটির রিপোর্টের মূল শিরোনামটি ছিল নিম্নরূপ—

"Towards on Enlightened and Humane Society". এই কমিটি শিক্ষা প্রশাসন এবং শিক্ষক শিক্ষণ কয়েকটি প্রধান বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে অনেকগুলি সুপারিশ করেন।

● সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুসারে (1976) শিক্ষা যুগ্ম তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং যৌথ দায়িত্বের ক্ষেত্রগুলি সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা হয়েছে।

● কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক যার বর্তমান নাম মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক মূলত নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি পালন করে থাকে—

(১) কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমা অনুসারে পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করে।

(২) শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নীতিগুলিকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠনের মাধ্যমে তাদের সুপারিশগুলি কার্যকর করে। বিভিন্ন শিক্ষা সংগঠনগুলির সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন ও তদারকির কাজ করে।

(৩) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষা সংগঠনগুলিকে সঠিক নির্দেশ দেওয়া ও তাদের উৎসাহিত করা তথা বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে সাহায্য করা কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের অন্যতম প্রধান কাজ।

(৪) রাজ্য সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা বহু শিক্ষার উন্নয়মূলক প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। তাই আর্থিক অনুদান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রশাসনের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

(৫) শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য দূর করে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রকল্প গৃহীত হয় যাতে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন, তপশিলি জাতি, উপজাতি ইত্যাদি এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ও নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টিকারী প্রকল্প চালু করা যায়। যেমন, সর্বশিক্ষা অভিযান বা Education for all. বর্তমান শিক্ষা জগতের একটি নতুন উদ্যোগ।

(৬) বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, নিরন্তর গবেষণা ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করে।

(৭) কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেমন, দিল্লি, চণ্ডীগড়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির শিক্ষা প্রশাসন সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়।

(৮) বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংগঠনসমূহ যেমন, U.G.C., NCERT, NCTE, AICTE, MCI ইত্যাদি সংস্থা সারাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্নস্তরের একপ্রকার সামঞ্জস্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

সুপারিশগুলি হল—

● রাজ্যস্তরের মোটামুটি বিদ্যালয় শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর), জনশিক্ষা তথা স্বাক্ষরতা প্রকল্প, উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে পরিকাঠামোগত ও সাংগঠনিক, প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।

● উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ভার কমিয়ে আনার সুপারিশ এবং কিছু কিছু বেসরকারি উদ্যোগ ও স্বশাসনকে স্বাগত জানানোর কথা বলা হয়েছে।

● শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation in Education) 1986-এ প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষানীতি বা NPE '86-এর Programme of Action (POA)-এ উল্লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ যার অন্যতম একটি দিক হল গ্রাম শিক্ষা কমিটি (Village Education Committee) গঠন করা, যাদের হাতে এক বা একাধিক গ্রামের শিক্ষার উন্নয়নের ভার থাকবে।

● দেশের সকল শিশুর জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

● মুক্ত শিক্ষা বা open বা distance mode of education-কে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে যে, ".....this open learning should bring higher education to every doorstep".

● শিক্ষার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

(১) B. Ed. (Bachelor of Education) এবং P.T.T. (Primary Teacher Training) কেবলমাত্র এককালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হিসাবে প্রচলিত ব্যবস্থায় চললেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি নিরবিচ্ছিন্ন স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্গত করা উচিত যাতে তারা শিক্ষা প্রক্রিয়ার আধুনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

(২) এই নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন—প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু কিছুকে জেলা অনুযায়ী DIET (District Institute of Education and Training)-এ উন্নীত করা, কিছু B. Ed. কলেজকে C.T.E.-তে (College of Teacher Education) রূপান্তরিত করা এবং কিছু শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে I.A.S.E.-তে (Institute of Advanced Studies in Education) উন্নীত করা। এইসব নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অন্তর্গত।

(৩) B. Ed. পাঠক্রমের ক্ষেত্রে দক্ষতাভিত্তিক এবং নিষ্ঠামুখী (Competency based and Commitment oriented) যা দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করবে তার প্রচলন সুপারিশ করা হয়েছে যাতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান উন্নয়ন ঘটে।

(৪) সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে যার একটি অন্যতম প্রধান প্রয়োগের ক্ষেত্র হল—Community Outreach Activities.

(৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ পরিকল্পনা (Internship Programme) এবং নেতৃত্বগুণের বিকাশের (Development of leadership quality) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়ন করা সম্ভব।

১.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা প্রশাসন এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমন্বয়, সংগঠন, পরিকল্পনা ও উপযুক্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন ও সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করে, শিক্ষাপ্রশাসন শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্য, সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন, কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, উদ্ভাবনী প্রচেষ্টায় উৎসাহদান, মানবসম্পদ ও বস্তু সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং সকলের আস্থা অর্জন করে লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়া।

শিক্ষা প্রশাসনের কার্যনীতি তথা পিরিধির অন্তর্গত হল পরিকল্পনা গ্রহণ। স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এই তিনপ্রকার পরিকল্পনা প্রয়োজন মতো গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার মেয়াদ যাই হোক না কেন, উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন ও নিয়োগ, পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে কোনো বাধা উপস্থিত হলে তার অপসারণ বা সমস্যার সমাধান এইসব শিক্ষা প্রশাসনের কর্মপরিধির অন্তর্গত। এ ছাড়াও, প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, তাদের উৎসাহ ও প্রেষণা বৃদ্ধি করা এবং সন্তুষ্টিবিধান এই সবই শিক্ষা প্রশাসনের অন্যতম কর্মপরিধি।

যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন শিক্ষার প্রশাসনকে নানাভাবে সফল ও সক্রিয় রাখে তাকে বলে শিক্ষা প্রশাসনের সংস্থা। শিক্ষা প্রশাসনের সংস্থা হিসাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ছাড়াও আছে নানা প্রকার স্থানীয় স্বায়ত্তসংস্থা। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে যে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা ছিল তাতে শিক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল রাজ্য বা আঞ্চলিক সংস্থার হাতে। স্বাধীনতার পর প্রথম শিক্ষাকে সংবিধানের রাজ্য তালিকায় রাখা হয় এরপর 1976-এ শিক্ষাকে আনা হয় যুগ্মতালিকায়। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক শিক্ষার নীতি প্রণয়ন, রাজ্যগুলিকে অনুদান বণ্টন, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থা, মুক্ত বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, UGC, NCERT, NCTE, AICTE, NIEPA ইত্যাদি উপদেষ্টা সংস্থাগুলি পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ করে থাকে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা অনেকটা সমান্তরাল। উভয়েই আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা গঠন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ

সম্পন্ন করে। স্থানীয় স্বায়ত্ত সংস্থাগুলির কাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি পরিকল্পনার রূপায়ণ।

জাতীয় শিক্ষানীতিকে (1986) পর্যালোচনা করার জন্য 1992-এ রামমূর্তি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বর্তমান ভূমিকাকে। তাদের সুপারিশে ব্যয়ভার কমানোর বিকেন্দ্রীকরণ, বেসরকারিকরণ, নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি স্থান পায়।

১.৮ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) Talyor-এর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব কী?

(খ) আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?

(গ) মেয়াদ অনুযায়ী কয়প্রকার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে?

(ঘ) শিক্ষা প্রসাসনের সংস্থা বলতে কী বোঝায়?

(ঙ) SCERT-র কাজ কী?

(চ) জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী যে-কোনো দুটি প্রশাসনিক নীতির কথা উল্লেখ করুন।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্যগুলি কী কী?

(খ) শিক্ষা প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকা কী?

(গ) শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিকা কতটা সমর্থনযোগ্য?

(ঘ) শিক্ষক শিক্ষণ সম্বন্ধে রামমূর্তি কমিটির মতামত সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

(ঙ) শিক্ষা প্রশাসনে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কী?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসন কাকে বলে? শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ও পরিধি আলোচনা করুন।

(খ) শিক্ষা প্রশাসনের মূল লক্ষ্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) প্রশাসনিক সংস্থা কাকে বলে? প্রশাসনিক সংস্থা হিসাবে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(ঘ) শিক্ষা প্রশাসন সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং রামমূর্তি কমিটির সুপারিশগুলি উল্লেখ করন। এইসব সুপারিশ কতটা কার্যকর করা হয়েছে?

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

একক ২ ❑ শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্ব
(Theories of Educational Administration)

গঠন (Structure)

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্ব

- ২.৩.১ শিক্ষা প্রশাসন ও নেতৃত্ব
- ২.৩.২ শিক্ষা প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

২.৪ শিক্ষা প্রশাসনের মূল তত্ত্বসমূহ

- ২.৪.১ ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব
  - —বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব
  - —প্রশাসনিক নীতি
  - —আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব
- ২.৪.২ নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব
- ২.৪.৩ আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব
  - —তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব
  - —আকস্মিকতা অভিমুখ তত্ত্ব

২.৫ সারসংক্ষেপ

২.৬ প্রশ্নাবলি

২.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা প্রশাসনের প্রকৃতি, পরিধি ও লক্ষ্য পাঠ করে বোঝা যায় পরিকল্পিত প্রশাসনের গুরুত্ব কতখানি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের নীতি নির্ধারণের জন্য প্রশাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞ প্রশাসকরা অনেক গবেষণা করেছেন। শুধু তাই নয় প্রশাসনের নীতি সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বা সবসময় এক

থাকে নি। এর ফলে অনেক প্রশাসনিক তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। এইসব তত্ত্বের কোনোটিই সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয় আবার কোনোটিই সম্পূর্ণ ভুল নয়। বরং বলা ভালো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রশাসনের নীতিতে বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রাধান্য থাকলেও অন্য ধরনের তত্ত্বের কিছু কিছু প্রতিফলন তাতে থেকে যায়। এই একটিতে সংক্ষেপে প্রধান প্রধান প্রশাসনিক তত্ত্বগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। তত্ত্বগুলি পাঠ করলে বোঝা যাবে সাধারণভাবে শিক্ষা বা বাণিজ্যিক ও সরকারি প্রশাসনের ভিত্তিতে তত্ত্বগুলির সৃষ্টি হলেও তার অধিকাংশই শিক্ষার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

২.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই কয়েকটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষা প্রশাসনের নেতৃত্বের প্রকারভেদ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসনের মূল তত্ত্বগুলির নাম বলতে পারবেন।
- ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বগুলির প্রকৃতি ও প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলি জানতে পারবেন।
- তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব ও আকস্মিকতা অভিমুখ তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।

২.৩ শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্ব (Theories of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশাসনের নীতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এর আগের এককে সংক্ষেপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই এককে দেওয়া হল। যে-কোনো শিক্ষা প্রশাসনের মূল কথাই হল নেতৃত্বদান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বলতে বোঝায় একধরনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নেতার সংগঠিত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে অন্য কর্মীরা উৎসাহিত হতে পারে। দক্ষতার মান উন্নত হতে পারে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি (Management) আরও সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হতে পারে। এই নেতৃত্ব প্রদানের ধরন অনুসারে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময় নানা তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন।

২.৩.১ শিক্ষা প্রশাসন ও নেতৃত্ব (Educational Administration and Leadership)

নির্দিষ্ট তত্ত্বগুলি আলোচনার আগে সাধারণভাবে নেতৃত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচনা করা দরকার। কিছু প্রশাসকের মধ্যে সহজাতভাবে নেতৃত্বের গুণগুলি প্রকাশ পায়, কিছুক্ষেত্রে নেতৃত্বদান বিষয়টি হয়ে ওঠে প্রথাগত—অর্থাৎ, যিনি নেতা তিনি প্রশাসনকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলি ইত্যাদি দ্বারাই চালিত করে থাকেন। আবার কখনও দেখা যায় নেতৃত্বের গুণে প্রশাসনিক কার্যকারিতা নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে সুষ্ঠুভাবে সাহায্য করে। প্রশাসনের শীর্ষে যিনি থাকেন তিনিই নেতা এবং প্রকৃতি অনুসারে এই নেতৃত্বপ্রদান বিভিন্ন ধরনের হতে পারে—

- স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ (Hypocratic leadership)
- গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ (Democratic leadership)
- আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব ঃ (Bureaucratic leadership)
- একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্ব ঃ (Dictatorial leadership)
- অবাধ নেতৃত্ব ঃ (Laissez-faire leadership)
- কর্মসম্পাদনী নেতৃত্ব ঃ (Transactional leadership)

২.৩.২ শিক্ষা প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Educational Making)

নেতৃত্বের একটি বিশেষ গুণ হল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। Mcfarland সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—

(ক) সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত

(খ) মৌলিক ও নিয়মমাফিক সিদ্ধান্ত

(গ) পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত এবং

(ঘ) অপরিকল্পিত বা নতুন সিদ্ধান্ত।

আবার Griffith সিদ্ধান্ত গ্রহণকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন—

(ক) অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Interim decision)

(খ) পুনর্বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision on reconsideration)

(গ) সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Creative decision)

সময় অনুসারে, পরিস্থিতির বাস্তবভিত্তি পর্যালোচনা করে সাংগঠনিক, ব্যক্তিগত বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মমাফিক সিদ্ধান্ত (Routine decision) নিতে হয় যা মূলত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি ও পরিকল্পনার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। কখনও প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য নেতৃত্বকে প্রভাবিত করে আবার কখনও বা নেতার গুণেই প্রতিষ্ঠান পরিচিতি পায়। গতানুগতিকভাবে বহু সিদ্ধান্ত চটজলদি এবং অপরিকল্পিতভাবে নেওয়া হলেও মূলত পরিকল্পিত সিদ্ধান্তই কোনো প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির মূল পাথেয়। এই পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত কতটা সৃষ্টিমূলক হবে তা নির্ভর করে নেতৃত্বের গুণগত মানের ওপর।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি Griffith ও Dewey-এর মত অনুসারে নিম্নরূপ—

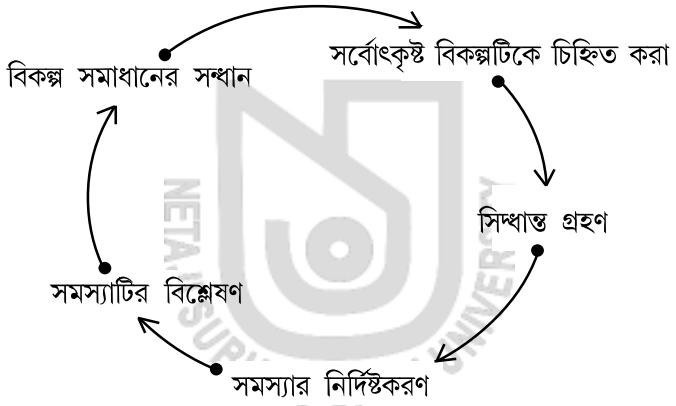

চিত্র ২.১ সিদ্ধান্ত গ্রহণের চক্রাকার ক্রমপর্যায়

সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ধাপগুলি নিম্নরূপ—

- সমস্যাটি বিবৃত করা।
- সমস্যার যতগুলি বিকল্প সমাধান হতে পারে সেগুলি নির্বাচিত করা।
- সর্বোৎকৃষ্ট বিকল্পটিকে চিহ্নিত করা।
- সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা, তার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এবং তার সীমাবদ্ধতা কতদূর তা বের করা।
- সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করা এবং মূল্যায়ন করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী যে শর্তাবলির মধ্যে সমস্যাটিকে বিচার করতে হবে সেগুলি উপস্থাপিত করা।

- তথ্য সংগ্রহ করা।
- কাঙ্খিত সমাধানগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করা।
- কাঙ্খিত সমাধানগুলিকে নিয়ম নিগড়ে (Programme) বেঁধে তাদের রূপায়িত করা।
- সমস্যার কাঙ্খিত সমাধানের মধ্যে যে কার্যাবলি আছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা।
- ফলাফলকে হিসাব করে বের করা।

২.৪ শিক্ষা প্রশাসনের মূল তত্ত্বসমূহ (Main Theories of Educational Administration)

শিক্ষা প্রশাসনের মূল তত্ত্বগুলিকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়—

(১) ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব (Classical Theory) যা প্রধানত আমলাতান্ত্রিক, গতানুগতিক, প্রশাসনিক উদ্যোগ বা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসরণ করে চলে।

(২) নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (Neo-classical Theory) যা প্রধানত মানবিক সম্পর্ক, প্রশাসনিক স্তরে ব্যক্তি বিশেষের গুরুত্ব বা ব্যাবহারিক উদ্যোগের ভিত্তিতে আলোচিত হয়।

(৩) আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Modern Management Theory) যা প্রধানত, আধুনিক ম্যানেজমেন্ট তত্ত্ব, সিস্টেমস তত্ত্ব (Systems Theory) ও কনটিনজেন্সি তত্ত্বের (Contingency Theory) ভিত্তিতে আলোচিত হয়।

যে-কোনো তত্ত্ব অনুসারেই শিক্ষা প্রশাসনিক উদ্যোগ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা গেলেও এদের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই। তা হল—প্রশাসনিক উদ্যোগের সাফল্য অর্জন করা।

২.৪.১. ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব (Classical Theory)

এই তত্ত্বটি প্রধানত বিগত দুই শতকের অত্যন্ত বহুল প্রচলিত প্রশাসনিক উদ্যোগ যা Adam Smith-এর ধারণা অনুসারে গৃহীত হয়েছিল। যেখানে কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উদ্যোগের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানী Schin এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন যে—

- সাধারণ, কর্মচারীরা আর্থিক সুযোগসুবিধা দ্বারা উৎসাহিত বোধ করে।
- কর্মচারীবৃন্দের পরোক্ষ উৎসাহপ্রদানের দ্বারা সংগঠনের মূল লক্ষ্য সহজেই নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কাজেই অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রদান এক্ষেত্রে সংগঠনের সাফল্যে বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।
- অকারণ মানসিক দ্বন্দ্ব বা প্রক্ষোভিক আচরণগত বহিঃপ্রকাশ এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয় কারণ তা অর্থনৈতিক সুবিধাপ্রদানের বিরোধী শক্তি রূপে ক্রিয়া করে।
- কর্মচারীদের ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ তা যে-কোনো প্রশাসনিক উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে অথবা সেই উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

এই ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসারে মূলত তিন ধরনের হয়—

(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Scientific Management Theory)

(খ) প্রশাসনিক নীতি (Administrative Principle)

(গ) আমলাতন্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব (Bureaucratic Organisation Theory)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Theory of Scientific Management) ঃ এই তত্ত্ব Fredrick. W. Taylor দ্বারা উদ্ভাবিত, যাঁকে এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। পরবর্তীকালে Frauk, Lilian Gilbreath, Henry L. Gautt এবং Harrington Emerson প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা এই তত্ত্ব আরও সমৃদ্ধ হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি আলোচিত হয়ে থাকে—

- বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে বিগত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ সবকিছুই এই তত্ত্বের মূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।
- যে-কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চালিত হয়।
- প্রশাসনের নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণকে খুব বেশি উৎসাহিত করা হয় না এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গৃহীত প্রচলিত পদ্ধতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।
- কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে করা হয়ে থাকে এবং আলাদা কোনো প্রথাগত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না।

- তত্ত্ববধায়কদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার ফলে দলগত কাজে উৎসাহত প্রদান করা হয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।
- প্রত্যেকটি কাজকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিভিন্ন উপএককে ভেঙে নেওয়া হয় যাতে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে সমান গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়।
- উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত দক্ষ কর্মী নির্বাচন এবং তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া বজায় রাখা প্রশাসনিক সাফল্যলাভের মূল কথা।

প্রশাসনিক নীতি (Administrative Principle) ঃ এই তত্ত্ব প্রধানত Henry Fayol-এর দ্বারা গৃহীত। যা পরবর্তীকালে Mary Parker Follet এবং Lyndall Urwick দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। পরবর্তীক্ষেত্রে এই তত্ত্ব Max Weber-এর উদ্যোগে পুনর্গঠিত হয়ে এর পরিবর্তিত রূপ আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত হয়।

Henry Fayol-এর প্রশাসনিক নীতির মূল কথাগুলি হল—

- ম্যানেজারের দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া প্রশাসনিক সিদ্ধান্তই মূল কথা। তাই সংগঠনের চালিকাশক্তি।
- মূল ছটি ক্ষেত্রে ম্যানেজার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন যেমন,
  —প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া (Technical Operations)
  —বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া (Commercial Operations)
  —আর্থিক প্রক্রিয়া (Financial Operations)
  —নিরাপত্তার প্রক্রিয়া (Security Operations)
  —হিসাবরক্ষার প্রক্রিয়া (Accounting Operations)
  —ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া (Managerial Operations)

মূলত, এই কাজগুলির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশদান, সহযোগিতা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ।

আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব (Theory of Bureaucratic Structure) ঃ Max Weber প্রধানত Henry Fayol-এর নীতি দ্বারা প্রভাবিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনার ছাপ রেখেছেন। তাঁর আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্বের মূল কথা হল—

- শ্রমের বিভাজন মূলত কর্মদক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই হওয়া উচিত।
- ক্ষমতার সুস্পষ্ট ক্রমোচ্চপর্যায় (hierarchy) কর্তৃত্বের স্তর-কে নির্দেশ করে। এর দ্বারা প্রত্যেক স্তরে নির্দিষ্ট ক্ষমতার গণ্ডি স্পষ্ট ও সীমিত হয়।
- কর্মচারীদের কর্তব্য এবং অধিকার সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছনীয়।
- নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গৃহীত কালজয়ী কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রশাসনিক দক্ষতার অন্যতম প্রধান শর্ত।
- কারিগরি দক্ষতা ও উৎকর্ষ অনুসারে কর্মচারীদের নিয়োগ ও উন্নতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসারে কাজ হয় বলে কোনো ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের সুযোগ সীমিত। নির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতি অনুসারে একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করে সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মানবসম্পদের অপচয় সবচেয়ে কম ঘটে।

কোনো পদ্ধতিই যেমন ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না তেমনই এই পদ্ধতিতে ফিতের ফাঁস, অতিরিক্ত কাগজপত্রভিত্তিক কাজ এবং ধীরগতিকে প্রায় সকলেই সমালোচনা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নিয়ম মেনে চলতে গিয়ে কোনো নির্দিষ্ট কাজের যথাযথ উৎকর্ষসাধন সম্ভব হয় না এবং কর্মচারীরা যন্ত্রের মতো দৈনন্দিন কাজ করে থাকে যা তাদের পক্ষেও একঘেয়েমির সৃষ্টি করে।

২.৪.২. নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব (Neo Classical Theory)

এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন Elton Mayo এবং তাঁর তত্ত্বের ভিত্তি হল Hawthorne পরীক্ষানিরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ভালো সুযোগসুবিধা, কর্মক্ষেত্রের সুন্দর পরিবেশ এবং সহকর্মীদের একে অপরের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই তত্ত্বের মূল কথা হল কর্মচারীদের মানবিক সম্পর্ক, মানসিক গঠন, প্রেষণা, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ (working climate) ইত্যাদির উন্নতি ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি। Abraham Maslow-র মত অনুসারে মানুষের যে পাঁচটি বিভিন্ন স্তরের চাহিদা আছে তার পূরণ ধাপে ধাপে করা সম্ভব এবং তার ফলে কর্মচারীদের প্রেষণার (Motivation) বৃদ্ধি হয় আর সেই সঙ্গে উৎপাদনশীলতা (Productivity) বৃদ্ধি পায়। এখানে কর্মীদের একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে দেখা হয় যারা পারস্পরিক উন্নত সম্পর্কের মাধ্যমে সহযোগিতা, সমন্বয় ও সহমর্মিতার সাহায্যে সমগ্র

প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষসাধন করে থাকে। তাদের নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রগুলি যদি আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক হয় (job satisfaction) তবে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎকর্ষসাধন ঘটে। যে-কোনো শিক্ষা প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন Katz, Maccoby, Morse এবং Ohio State University-র গবেষকগণ। এঁদের মতে দুটি মূল শর্ত এই প্রশাসনিক নেতৃত্বের দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ তৈরি করে।

- সুবিবেচনা (Consideration) ঃ নেতা ও কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি হলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সুবিবেচকের মতো আচরণ করে।
- উদ্যোগবিষয়ক গঠন (Initiating Structure) ঃ একটি নির্দিষ্ট কর্ম পরিবেশের সৃষ্টি করা যেখানে প্রত্যেক কর্মী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজের উদ্যোগে করণীয় কাজ সম্পন্ন করে।
- আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (Inter-personal relationship) ঃ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক উন্নত হলে এই তত্ত্ব অনুসারে প্রশাসনিক সাফল্য অর্জন করা মোটেই কঠিন নয়।

২.৪.৩. আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব (Modern Management Theory)

আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বগুলি হল—

(১) অভিজ্ঞতাভিত্তিক তত্ত্ব (Empirical Theory) যা Earnest Dale-এর নামকরণ অনুসারে ক্রিয়া সম্পাদন তত্ত্ব (Operational Theory) বলেও পরিচিতি। এই তত্ত্ব অনুসারে অতীতের অভিজ্ঞতা, তত্ত্ব, তথ্য ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়।

(২) সামাজিক ব্যবস্থা তত্ত্ব (Social System Theory) ঃ Chester Barnard একে একপ্রকার ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব বা Management Theory হিসাবে উপস্থাপিত করেন। এখানে একই কাজে নিয়োজিত একদল কর্মীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদ্যমের একমুখীকরণের (orientation) মাধ্যমে মূল প্রশাসনিক উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়।

(৩) সমাজ-প্রযুক্তি ব্যবস্থা তত্ত্ব (Socio-technical System Theory) ঃ England-এর Tavistock Institute-এ E. L. Trist এবং তাঁর সহযোগীরা এই তত্ত্বের প্রস্তাব করেন। যেখানে তত্ত্বের মূল কথাটি ছিল মানুষ ও যন্ত্রের সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সাফল্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রদ্ধতির প্রয়োগ নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা।

(৪) সিদ্ধান্ত তত্ত্ব (Decision Theory) ঃ যার মূল কথাগুলি এই এককের গোড়ায় আলোচিত হয়েছে। যেখানে নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(৫) কার্যপরম্পরা ও পরিস্থিতি অভিমুখ তত্ত্ব (Contingency or Situational Approach Theory) ঃ যা Taylor এবং Gilbreth প্রথম প্রস্তাব করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে প্ররিস্থিতি বিচার করে প্রশাসন পরিচালনা করা হয়। যা পরে বিশদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(৬) ব্যবস্থাপকের ভূমিকা তত্ত্ব (Managerial Role Theory) ঃ Henry Mintzberg প্রস্তাব করেন প্রশাসনের ক্ষেত্রে Manager-এর ভূমিকা মুখ্য বলে বিবেচিত হয়। কারণ তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি লক্ষ্য স্থির করেন, কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করেন, নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঠিক রাখেন, প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেন এবং নির্দিষ্ট নীতি, সম্পদ ও সময় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৭) সক্রিয়তার অভিমুখ তত্ত্ব (Operational Approach Theory) ঃ P. W. Bridgman-এর মত অনুসারে এই তত্ত্ব গঠিত। এই তত্ত্বে কোনো ক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট বিভাজন, দায়িত্ব বণ্টন, কর্তব্যপালন, সময়সীমা ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষ কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

(৮) তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব (Systems Approach Theory) ঃ এই তত্ত্বটির কিছুটা বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব (System Approach Theory) ঃ এই তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে Chester. I. Barnard-এর মস্তিষ্ক প্রসূত হলেও পরবর্তীক্ষেত্রে এর বহু রূপান্তরসাধন করেন Ludwig Von Bertalanffy—যাঁকে এই তত্ত্বের জনক বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন উপাদানগুলির একত্রে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি system রূপে দেখার কথা বলা হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র কোনো একক উপাদানের চেয়েও সব এককগুলির সমষ্টিগত রূপ ও তার ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে। এখানে প্রতিটি উপাদানই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং পারস্পরিক সংযুক্তির মাধ্যমে সব উপাদানগুলি একত্রে ক্রিয়া করে কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রত্যেকটি system বা তন্ত্রের অনেকগুলি উপতন্ত্র (subsystem) থাকে যা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
- প্রতিটি সিস্টেম একটি বৃহত্তর সামাজিক সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যা একত্রিত হয়ে একটি সমগ্র সামাজিক ক্ষেত্রকে পরিচালনা করে থাকে।

- এরা অপেক্ষাকৃত গভীর ও জটিল সম্পর্কের বন্ধনে পরস্পর যুক্ত থাকে এবং প্রত্যেকটি সাবসিস্টেম মূল উদ্দেশ্য পালনে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।
- প্রত্যেকটি সিস্টেম তার প্রয়োজনীয় শক্তি বা তথ্য আহরণ করার জন্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে যা বৃহত্তর পরিবেশের অঙ্গ।
- বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সিস্টেম তার অন্তর্গত বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয়।
- কোনো একটি সিস্টেম একা একা কাজ করতে পারে না। তার জন্য দরকার হয় অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত সিস্টেমগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা।

Systems বলতে সাধারণত দুই ধরনের সমন্বয়কে বোঝায়।

প্রথমত, মুক্ত তন্ত্র (Open System)

এখানে অন্তিম উৎপাদন প্রাথমিক উৎপাদনকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না বা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে না।

দ্বিতীয়ত, বন্ধ তন্ত্র (Closed System)

যেখানে, সুনির্দিষ্ট প্রতি সংকেতের মাধ্যমে প্রাথমিক উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা সহজতর হয়। আবার প্রাথমিক উপাদানের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেলে অন্তিম উৎপাদনের মানও বৃদ্ধি পায়। মুক্ততন্ত্রে একবার উৎপাদন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে কোনো কিছু উৎপাদিত হলে আর কোনোভাবেই তাকে

নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। অথচ বন্ধতন্ত্রের সুবিধা এই যে প্রতি সংকেতের সাহায্যে অন্তিম উৎপাদনের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

আকস্মিকতা অভিমুখ তত্ত্ব (Contingency Approach Theory) ঃ এই তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে Fiedler দ্বারা প্রস্তাবিত হলেও পরবর্তীকালে তিনি Hersey এবং Blanchard-এর সহায়তায় এর অনেক পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেন। এই তত্ত্বের তিনটি মূল উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

- নেতৃত্বের উপযোগিতা।
- নেতৃত্বের পারস্পরিক পার্থক্য।
- নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বিচারে নেতৃত্বের ভূমিকা বদল।

এই তত্ত্ব প্রধানত নেতৃত্বের দায়িত্ব ও গুণাবলিকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে থাকে এবং উদাহরণ সহযোগে বোঝানো যায় যে কীভাবে পরিস্থিতির বদল ঘটলে নেতৃত্বের ভূমিকা সাময়িকভাবে পালটে যেতে পারে। ধরা যাক, কোনো একটি দামি গাড়ি চড়ে কোনো বড়ো কর্তা অনেক দূরের কোনো সংস্থার মালিকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। গাড়িটি চালাচ্ছে একজন সাধারণ কর্মচারী যে ওই সংস্থায় ড্রাইভার রূপে নিয়োজিত। উভয়ের দায়িত্ব, নেতৃত্ব এবং গুণগত কার্যক্ষমতার মধ্যে সাধারণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোনো তুলনাই চলে না। কিন্তু জনমানবহীন হাইওয়েতে হঠাৎ কোনো কারণে গাড়িটি খারাপ হয়ে গেলে ওই বিশেষ পরিস্থিতির বিচারে সাময়িকভাবে গাড়িটিকে পুনরায় চালু করার দায়িত্বভার এসে বর্তায় সেই সাধারণ ড্রাইভারটির ওপরে। এক্ষেত্রে ওই পরিস্থিতিতে ওই ড্রাইভারের নেতৃত্বগুণ ও কর্মদক্ষতা পিছনের সিটে বসে থাকা বড়ো কর্তাটির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বের এই প্রকারটিকে পরিস্থিতিভিত্তিক নেতৃত্বের অভিমুখ (situational leadership approach) বলা হয়ে থাকে।

অন্য আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে Feidler L.P.C. বা Last Preferred Co-worker বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছেন যা এই তত্ত্বের অন্য আর একটি রূপ। নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্ব অনুসারে একজন নেতা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্থার কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে থাকেন—যেখানে কোনো কর্মী তার দক্ষতার স্বীকৃতি পায় আবার কাউকে দক্ষতার অভাবে ওই নেতার বা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে L.P.C. বা সর্বাপেক্ষা কম দক্ষ কর্মীর পরিচয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়।

২.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকারিতা নির্ভর করে দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর। তার একটি হল নেতৃত্ব এবং অপরটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অনেক ধরনের নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব, গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব, আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব। একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্ব, অবাধ নেতৃত্ব, কর্মসম্পাদনী নেতৃত্ব ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নেতা এবং কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বণ্টন প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দরকার হয় উপযুক্ত সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের। যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় তার মধ্যে আছে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, মৌলিক ও নিয়মমাফিক সিদ্ধান্ত, পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত এবং অপরিকল্পিত বা নতুন সিদ্ধান্ত। অপরপক্ষে গ্রিফিথ তিনপ্রকার সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন—অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত, পুনর্বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত এবং সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত। সমস্ত পরিকল্পিত সিদ্ধান্তই ধাপে ধাপে গ্রহণ করা হয়। সমস্যার বিবরণ, বিকল্প সমাধান বিচার, প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে ধাপে ধাপে সমস্যার সমাধান করা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উদ্দেশ্যপূরণ করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষা প্রশাসনের অনেকগুলি তত্ত্ব প্রশাসন বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত করেছেন। এর মধ্যে প্রধান চারপ্রকার তত্ত্ব যথাক্রমে, ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব, নয়া ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব, আধুনিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব ও আকস্মিকতা অভিমুখ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অ্যাডাম স্থিম। এই তত্ত্বে কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তিনপ্রকার ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের নাম—বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব, প্রশাসনিক নীতি ও আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মবিশ্লেষণ (Job analysis), কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষকর্মী নির্বাচন, তত্ত্বাবধান ও দলগত কাজে উৎসাহদান ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রশাসনিক নীতিতে বলা হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকর্তা ব্যবস্থাপক (manager)। প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া, বাণিজ্যিক প্রক্রিয়া, আর্থিক প্রক্রিয়া, নিরাপত্তার প্রক্রিয়া, হিসাবরক্ষার প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এই ছয়টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

প্রশাসনিক কাজে আমলাতান্ত্রিক সংগঠন তত্ত্ব একটি বহুল প্রচলিত তত্ত্ব যা হেনরি ফেওল-এর নীতি নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারীদের ওপর পূর্বনির্ধারিত দায়িত্ব বণ্টন ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আমলাদের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন রকম। নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে কর্মীদের সুবিধা সম্বন্ধে সুবিবেচনা এবং উদ্যোগ প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে প্রশাসন পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। সবচেয়ে ভালো প্রশাসক তিনিই যিনি কর্মীদের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যেমন সজাগ দৃষ্টি রাখেন, তেমনি প্রত্যেকের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে সমান উদ্যোগী বা সচেতন।

আধুনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বে আট রকমের তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। যেমন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক তত্ত্ব, সামাজিক ব্যবস্থা তত্ত্ব, সমাজপ্রযুক্তি ব্যবস্থার তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত তত্ত্ব, কার্যপরম্পরা ও পরিস্থিতি অভিমুখ তত্ত্ব, ব্যবস্থাপকের ভূমিকা তত্ত্ব, সক্রিয়তা অভিমুখ তত্ত্ব এবং তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব। এর মধ্যে তন্ত্র বা system কে একাধিক উপতন্ত্রের সমন্বয় হিসাবে ধরে নিয়ে মুক্ত ও বন্ধ এই দুইপ্রকার তন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। আর পরিস্থিতি অভিমুখ তত্ত্বে উপস্থিত পরিস্থিতির দাবি মেনে এবং কার্য পরম্পরা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

২.৬ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসনের তত্ত্বের প্রয়োজন কেন?

(খ) ম্যাকফারল্যান্ডের মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত?

(গ) ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব কী?

(ঘ) প্রশাসনিক নীতি কাকে বলে?

(ঙ) আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বের মূল নীতি কী?

(চ) সামাজিক ব্যবস্থা তত্ত্ব কাকে বলে?

(ছ) তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্ব কাকে বলে?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্বের প্রভেদগুলি উল্লেখ করুন।

(খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ কী? সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর কীভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা নির্ভর করে?

(গ) আমলাতান্ত্রিক সংগঠন কথাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) প্রশাসনিক নীতিতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়?

(ঙ) নয়া ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব কাকে বলে?

(চ) সমাজপ্রযুক্তি ব্যবস্থা তত্ত্বের মূল কথা কী?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষা প্রশাসনের ক্ল্যাসিকাল তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। এই তত্ত্ব বর্তমানে কতটা প্রযোজ্য?

(খ) তন্ত্র অভিমুখ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। এই তত্ত্বকে কেন আধুনিক প্রশাসনিক তত্ত্ব বলা হয়?

(গ) শিক্ষা প্রশাসনে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই দুই সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর একটি রচনা লিখুন।

একক ৩ ❑ সংস্থার ধারণা (Concept of Organisation)

গঠন (Structure)

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ সংস্থার ধারণা

৩.৪ সংস্থার নীতি

৩.৪.১ বিভাগীকরণ

৩.৪.২ কর্মী নিয়োগ

৩.৫ কর্তৃত্ব

—গতানুগতিক প্রাচীনপন্থী কর্তৃত্ব

—আইনি কর্তৃত্ব

—আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব

—গ্রহণীয়তার তত্ত্ব

—দক্ষতার তত্ত্ব

৩.৬ ক্ষমতার প্রয়োগ ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ

৩.৭ প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন

৩.৭.১ স্বপরিচালিত সংস্থা

৩.৮ সাংগঠনিক কাঠামো

৩.৯ সারসংক্ষেপ

৩.১০ প্রশ্নাবলি

৩.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা প্রশাসনের লক্ষ্য ও তত্ত্বে বিভিন্ন স্থানে প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্ব ইত্যাদি কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশাসন যেহেতু একটি উদ্দেশ্যমুখী ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য

হল নেতৃত্ব ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য পূরণ করা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে এক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কী, তার উপাদান ও ক্রিয়াগুলি কী কী? এই বিষয়টিকে অবলম্বন করে বর্তমান এককটি লেখা হয়েছে। একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান থাকলে তবেই তার কর্মীরা সেখানে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবেন। প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকরা তাঁদের সুপরিচালনার মাধ্যমে কর্মীদের কাজের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ করবেন।

সংস্থার ধারণা মূলত পাশ্চাত্য জগতের অবদান হলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে এই ধারণা অপরিচিত ছিল না। ভারতে বৌদ্ধযুগে নালন্দা ও বৌদ্ধ সংঘগুলি সুসংগঠিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হত। তক্ষশিলার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমান যুগে নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে সংস্থার ধারণা জটিলতর হয়েছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাও জটিলতর হয়েছে। সেজন্য কোনো একটি সংস্থার নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের পক্ষে অর্থাৎ শিক্ষা প্রশাসকদের পক্ষে শুধুমাত্র তাঁর নিজের সংস্থার সংগঠনটিকে জানাই যথেষ্ট নয়। তাঁর জানা দরকার সংগঠনের প্রকৃতি ও অন্যান্য বিষয়গুলি। এই জন্যই সংস্থার ধারণা (Concept of Organisation) পাঠ করা দরকার।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- সংস্থা কথাটির প্রশাসনিক অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন।
- সংস্থার নীতিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভাগীকরণের তাৎপর্য বলতে পারবেন।
- সংস্থার কর্তৃত্ব সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের প্রয়োজনীয়তা ও ধারণা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- সাংগঠনিক কাঠামো কাকে বলে ও তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৩ সংস্থার ধারণা (Concept of Organisation)

কোনো সংস্থার গঠনপ্রক্রিয়া ও তার কার্যকরিতা সঠিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদের এই ধারণাটিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। আধুনিক সভ্যতায় কোনো সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা। Etzioni-র ভাষায় উপযুক্ত, দক্ষ সংস্থার উপস্থিতি আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করে, উন্নত করে, আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আমাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করে এবং সর্বোপরি আমাদের গণতান্ত্রিক ভাবধারার বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে সাহায্য করে। তাঁর ভাষায়, "We are born in organisations, educated by organisations and most of us spend much of our time working for organisation."

কোনো একটি সংস্থাকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করা যায়—(১) মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং (২) পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে।

Ralph. C. Davis সংস্থা বলতে কিছু মানুষের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন যারা কোনো নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে কাজ করে সমষ্টিগতভাবে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে কোনো একটি সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা করে।

Oliver Sheldon কোনো সংস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সেই সংস্থার কার্যপদ্ধতির ওপর জোর দিয়েছেন। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন কর্মীদের সম্মিলিত চেষ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া, কার্যপ্রণালীর বিজ্ঞানসম্মত ধাপ অনুসরণ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি নির্দিষ্ট সংস্থার কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যা করেছেন এবং এইসব বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত রূপকেই সংস্থার পরিচয় হিসাবে তুলে ধরেছেন।

যে-কোনো একটি সংস্থা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়েই গড়ে ওঠে যার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন মানুষকে কিছু সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি মেনে চলতে হয় যাতে সুষ্ঠুভাবে ওই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয় ও সুনাম হয়।

৩.৪ সংস্থার নীতি (Principles of Organisation)

যে-কোনো সংস্থা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে থাকে। নীতিগুলি হল—

● **উদ্দেশ্যের নীতি (Principle of Goal) ঃ** সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সঠিক নির্বাচন যা

বাস্তবোচিত হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অনুসারে সেই উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। অর্থাৎ অবাস্তব লক্ষ্য নিয়ে এগোলে সেই সংস্থার ভরাডুবি অবশ্যম্ভাবী।

● **সংহতির নীতি (Principle of Integration) ঃ** কোনো সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সবচেয়ে অধস্তন কর্মচারীটিরও মূল উদ্দেশ্য এবং কাজের ধারা যেন সংস্থাটির মূল লক্ষ্যের সঙ্গে যথাযথভাবে খাপ খেয়ে যায় যাতে কার্যপদ্ধতির মধ্যে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

● **ব্যক্তিগত ভূমিকার নীতি (Principle of Individual Role) ঃ** প্রত্যেকটি কর্মীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। যা সাধারণভাবে গোটা সংস্থারই দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

● **সম্পর্কের নীতি (Principle of Relation) ঃ** কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় থাকলে তবেই সংস্থার কার্যপ্রণালী উন্নত হয় এবং কর্তৃপক্ষের এই বিশেষ দিকটিতে নজর দেওয়া উচিত।

● **বোঝাপড়ার নীতি (Principle of Understanding) ঃ** সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট কর্তব্য, দায়িত্ব ও কাজের পরিধি সম্বন্ধে প্রত্যেকটি কর্মীকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয় যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে।

● **বিকেন্দ্রীকরণ নীতি (Principle of Decentralisation) ঃ** আধুনিক মতবাদ অনুসারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারণা হলেও এর মূল অসুবিধার জায়গাটি হল একাধিক স্তর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাপ্রদান। যা অনেকসময় প্রশাসনিক গোলযোগ (administrative chaos) সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য বিকেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য ও যোগাযোগ থাকা দরকার।

● **দায়িত্ব বণ্টন নীতি (Principle of Delegation of Responsibility) ঃ** কর্মীদের নির্দিষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব দেওয়া উচিত যাতে তা পালন করতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়।

● **কর্মী নির্বাচন নীতি (Principle of Staff Selection) ঃ** যে-কোনো কাজের ধরন, কার্যপ্রণালী ইত্যাদি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে কোনো কর্মীর পক্ষেই সেই কাজে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মী নির্বাচন, সঠিক কর্মীগোষ্ঠীর জন্য সঠিক নেতা নির্বাচন, সঠিক হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া যে-কোনো সংস্থার সাফল্যের মূল কথা।

● **নেতৃত্বের নীতি (Principle of Leadership) ঃ** কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি পালন করলেই (Rule book) খুব কড়া প্রশাসক (hard task master) হওয়া যেতে পারে কিন্তু নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োজনীয় নমনীয়তা বা উদ্ভাবনী শক্তি ছাড়া কোনো প্রশাসন বা সংস্থা সাফল্য পেতে পারে না।

৩.৪.১ বিভাগীকরণ (Departmentation)

কোনো সংস্থার মূল নীতি নির্ধারণ থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, সুনির্দিষ্ট কর্মদক্ষতা অনুসারে দক্ষতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হাতে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া উচিত। কোনো সংস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে এজন্যই নির্দিষ্ট বিভাগীকরণ (departmentation) অত্যন্ত জরুরি। ধরা যাক, কোনো সংস্থায় যিনি কম্পিউটার সেন্টারের দায়িত্বে থাকবেন তাঁর দক্ষতা যেমন তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত তেমনই তাঁর কাছে ওই সংস্থার পাঠক্রম বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো কাজ আশা করা উচিত নয়। আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেমন, নির্দিষ্ট দক্ষ কর্মীদের দরকার তেমনই কোনো সংস্থার জনসংযোগের (Public relations) ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। কোনো সংস্থার পরিকাঠামো (Infrastructure) যাঁরা দেখবেন তাঁদের কর্মপদ্ধতি গবেষণা ও বিকাশ (research and development) বিভাগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৩.৪.২ কর্মী নিয়োগ (Appointment of Staff)

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে যে-কোনো সংস্থার কর্মীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—(১) অদক্ষ কর্মী (unskilled staff), (২) অল্প দক্ষকর্মী (semi-skilled staff), (৩) দক্ষকর্মী (skilled staff)।

সাধারণভাবে বিভাগীকরণের সময় এইসব কর্মীদের বিভিন্ন দায়িত্ব অনুসারে পিরামিডের আকৃতিতে সাজানো হয়ে থাকে। সংখ্যাগত দিক থেকে যদি ধরে নেওয়া যায়, একজন দক্ষকর্মীর অধীনে চারজন অল্প দক্ষকর্মী এবং ছ'জন অদক্ষ কর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো একটি বিভাগে কাজ করে, তবে দায়িত্বের শীর্ষে থাকবেন ওই দক্ষকর্মী। নীচের চিত্রে দেখানো হয়েছে বিষয়টি।

চিত্র-২ : কর্মীর দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্বগত অবস্থান।

সাধারণভাব, বিভিন্ন ধরনের সংস্থা তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও কর্মীদের সংখ্যা ও ধরন অনুসারে বিভাগীকরণ করে থাকে। প্রত্যেক বিভাগ তাদের নিজস্ব লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে ও তা পূরণের চেষ্টা করে। প্রত্যেক বিভাগের একজন করে ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক থাকেন যাঁর ভূমিকা প্রধানত ব্যবস্থাপকের। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসকের ভূমিকার নিয়ন্ত্রণ ও যোগসূত্র স্থাপনের জন্য থাকেন কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যাঁর বা যাঁদের মূল দায়িত্ব হয় যোগসূত্র স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ (co-ordination and control)। কোনো সংস্থার সকল বিভাগের কার্যপদ্ধতি যদি সঠিকভাবে একমুখী (orientation in unidirectional manner) হয় তবে ওই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূরণ করা সহজ হয়। কোনো অর্কেস্ট্রায় সব কটি বাদ্যযন্ত্র একই সুরে বাঁধা থাকলে যেমন ওই সংগীতের মূর্ছনাকে সুরমুক্ত ও শ্রুতিমধুর করে তোলে তেমনই ওই অর্কেস্ট্রার কোনো একটি বা দুটি যন্ত্র যথাযথ বাঁধা না হলে সঙ্গীতের মূল উপস্থাপনাটিই ব্যর্থ হয়ে যায়। একটি সংস্থার সবকটি বিভাগই হল এইসব বিভিন্ন যন্ত্রগুলির মতো। যাদের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত ঐকতানে সাফল্য ও সুনাম সহজেই লাভ করা যায়।

৩.৫ কর্তৃত্ব (Authority)

Henry Fayol কর্তৃত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তা এক ধরনের অধিকার যার দ্বারা হুকুম বা নির্দেশ দেওয়া যায় এবং অন্যরা তা পালন করে। এই কর্তৃত্ব থেকেই প্রশাসনিক ক্ষমতা আসে এবং কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে কর্তৃত্বের সঙ্গেই একত্রে জড়িত থাকে। কর্তৃত্ব প্রধানত কোনো নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতেই ন্যস্ত থাকে যার সাহায্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন নির্দেশাবলির সাহায্যে অধস্তন কর্মচারীদের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ককে নানাভাবে দেখা যায় যেমন—

● **গতানুগতিক প্রাচীনপন্থী কর্তৃত্ব (Traditional Authority) ঃ** প্রাচীনপন্থী কর্তৃত্বে কর্তা ও নেতার পারস্পরিক সম্পর্ক রাজা-প্রজার অথবা, প্রভু-ভৃত্যের মতো।

● **আইনি কর্তৃত্ব (Legal Authority) ঃ** এখানে আইনের ভিত্তিতে কর্তৃত্বের ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। কোনো আইনের চোখে দোষী কোনো ব্যক্তির সাজা দেওয়ার ভার থাকে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর। যেমন—পুলিশ বা বিচারক ইত্যাদি।

● **আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) ঃ** অনেক সময় নেতার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এতই প্রবল হয় যে অন্যরা সহজেই তার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়।

● **গ্রহণীয়তার তত্ত্ব (Acceptance Theory) ঃ** Chester Barnard-এর মত অনুসারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের কিছু কিছু জায়গা অন্যরা সহজেই মেনে নেয় যদিও তা সবসময় সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে। সাধারণ যুক্তিগ্রাহ্য নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা না থাকলেও এক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার জন্য অধস্তন কর্মচারীরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব মেনে নেয়।

● **দক্ষতার তত্ত্ব (Competency Theory) ঃ** পেশাদারি দক্ষতার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব কাজে দক্ষতা তার পেশাদারি কর্তৃত্বকে বজার রাখতে সাহায্য করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পেশাদারি ব্যক্তি জানেন যে তাঁর কোনো কাজে অসুবিধা হলে তিনি অপেক্ষাকৃত দক্ষ কোনো মানুষের কাছে সাহায্য পেতে পারেন। অধিকাংশ সংস্থায় কোনো একটি বিশেষ ধরনের কর্তৃত্ব অপেক্ষা প্রায় সব কয়প্রকার কর্তৃত্বের সমন্বয় দেখা যায়। অবশ্য গতানুগতিক কর্তৃত্বের ধারণা এখন সম্পূর্ণই অচল।

৩.৬ ক্ষমতার প্রয়োগ ও কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (Delegation of Authority and Decentralisation)

প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্যে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত জরুরি কারণ এর দ্বারা কিছু কিছু দায়িত্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপরে অর্পণ করলে প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজের চাপ কমে। এই বিকেন্দ্রীকরণ একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার উপযোগী তেমনি ভবিষ্যতের নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনের ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপের কর্মচারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।

কোনো সর্বোচ্চ পদে আসীন প্রশাসক যদি দৈনন্দিন সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বগুলি অন্যদের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করে দিয়ে তার উপযুক্ত তদারক করতে পারেন তাহলে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারেন। কর্তৃত্বের বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিটি কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল যা একে একে নীচে আলোচিত হল।

- কোনো নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়ে তবেই সেই ভাবে কারও হাতে দেওয়া উচিত।
- প্রত্যেকটি কাজের পরিধি, সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব এবং যথাযথ কার্যকারণ সম্পর্ক ও

দায়বদ্ধতার বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে তাঁর কাজের গন্ডি কতটুকু এবং তাঁর প্রত্যক্ষ ঊর্ধ্বতন কর্তাকে।

- কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব ঠিকভাবে বোঝানো না গেলে তা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কর্মীদের কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতি সংকেত নেওয়া উচিত যাতে কোনো অস্পষ্টতা থাকলেও তা সহজেই দূর হয়।
- ক্ষমতা ও দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে শুধু যে প্রশাসনের ওপরতলার বোঝা কমে তাই নয় এতে অধস্তন কর্মচারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা যায়।
- নেতৃত্বের গুণাবলি এবং উপযুক্ত দায়িত্ব নেওয়ার মানসিকতা তৈরির মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কর্তৃত্ব নেওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের ক্রমশ তৈরি করে নেওয়া যায়।
- কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল এর ফলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ অসুবিধার দিক হল এই যে অধস্তন কর্মীরা যদি সঠিকভাবে উৎসাহিত বোধ না করে তাহলে তাদের হাতে দায়িত্ব দিলে তা সবসময় মঙ্গলজনক নাও হতে পারে।
- Koonez এবং O'Donnel-এর মতে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত অধস্তন কর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা পায়, আত্মবিশ্বাসী হতে পারে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস লাভ করে এবং কোনো ভুল থেকেও সহজে শিক্ষা নিতে পারে।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে অনেক বেশি ধৈর্যশীল হতে হয়। কারণ প্রাথমিকভাবে অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রশাসনিক ভুল করতে পারে।
- নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ইত্যাদি বাস্তবসম্মত হলে কর্তৃত্বপ্রদান তথা বিকেন্দ্রীকরণের কাজটি অপেক্ষাকৃত বেশি সাফল্য লাভ করে।
- কোনো সংগঠনের আকার, গঠনগত জটিলতা, কর্মীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা, স্পষ্টভাষায় মত বিনিময়ের ক্ষমতা ইত্যাদি এই প্রক্রিয়াকে সফল করতে সাহায্য করে, না হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৩.৭ প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন (Autonomy of Institutions)

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে উচ্চতর শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে যে বিপুল চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঐতিহাসিক কারণে এবং ঐতিহ্যের কথা মাথায় রাখলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও এই বিশাল প্রশাসনিক দায়ভার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বহন করা ক্রমশ অত্যন্ত গুরুতর বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলেই রাজ্য সরকারি স্তরে যে কয়েকটি সমাধানসূত্র নিয়ে আলোচনা চলছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল,

- আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে যাওয়া। যেমন, নদিয়া জেলার বেশ কিছু কলেজ যা আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল তা বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়া হয়েছে।
- উত্তর চব্বিশ পরগনার বেশ কিছু কলেজকে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তার অধীনে নিয়ে যাওয়ার প্রশাসনিক চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।
- কলকাতায় অবস্থিত কিছু বেসরকারি মালিকানার সুপরিচিত কলেজকে সরাসরি প্রশাসনিক স্বশাসনের আওতায় আনার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। যার মধ্যে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ইতিমধ্যেই স্বশাসন ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করেছে। আগামী ছয় বৎসর এই স্বশাসন ব্যবস্থার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করলে এই নতুন মডেলটির যৌক্তিকতা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত বেশ কিছু কলেজ যারা বিভিন্ন বিষয়ে ইতিমধ্যেই স্নাতকোত্তর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা চালু করেছে তাদের ওই স্নাতকোত্তর বিভাগগুলিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পঠনপাঠন ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে স্বশাসন দিয়েছে। এই ধরনের স্বশাসন ব্যবস্থার মূল কথা হল—
- তারা নিজস্ব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং বোর্ড অফ স্টাডিজ গঠন করতে পারে এবং উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতায় তারা নিজস্ব পাঠ্যসূচি, পঠনপাঠন পদ্ধতি, অতিথি অধ্যাপক নিয়োগ, পরীক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। যদিও এই

ধরনের স্বশাসন ব্যবস্থাকে শিক্ষাগত স্বশাসন (academic autonomy) বলা হচ্ছে কারণ অর্থনৈতিকভাবে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে-কোনো কলেজের স্নাতকোত্তর স্বশাসিত বিভাগগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তথা রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল।

- কলকাতার অন্যতম প্রধান ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজকে স্বশাসন দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ স্বশাসনের বিপক্ষে যাওয়ায় রাজ্য সরকার এ বিষয়ে এখনও কোনো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।
- বেশ কিছু সরকারি কলেজকে একত্রে একটি Autonomous College Cluster (স্বশাসিত মহাবিদ্যালয়গুচ্ছ) রূপে স্বশাসন দেওয়ার বিষয়টি সরকারের প্রশাসনিক স্তরে চিন্তাভাবনার অন্যতম প্রধান বিষয় হলেও এখনও এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

৩.৭.১ স্বপরিচালিত সংস্থা (Self Management Institution)

স্বপরিচালিত সংস্থা বলতে মূলত সেইসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বোঝায় যারা প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল না হলেও পাঠ্যসূচির এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে এবং তাদের অধীনেই পঠনপাঠন ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এইসব প্রতিষ্ঠানে ভরতির ক্ষেত্রে আলাদা পরিচালক সংস্থার আয়ত্তাধীন আসন সংখ্যা সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুসারে পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে এবং তার সাহায্যে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি 'ক্যাপিটেশন ফি', অর্থাৎ ভরতির জন্য এককালীন দেয় বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে যোগ্যতা অপেক্ষাও আর্থিক সক্ষমতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

- কোনো কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থা যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে All India Council of Technical Education (A.I.C.T.E.) ; Medical শিক্ষায় Medical Council of India (M.C.I.) এবং শিক্ষক শিক্ষণে National Council of Teacher Education (N.C.T.E.) ইত্যাদি সরাসরি বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত কলেজের অনুমোদন দেওয়া শুরু করার পর থেকে সারা দেশ জুড়ে বেসরকারি পুঁজি এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং উন্নততর পরিকাঠামো ও পরিসেবার আকর্ষণে বহু শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে অর্থ ব্যয় করেও এইসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দারস্থ হচ্ছে।

- কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের নিয়মকানুন খুব সামান্যই পালন করে এইসব স্বশাসিত এবং স্বনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রশাসনিক বা শিক্ষাগত কর্মকাণ্ড চালায় যেখানে প্রতিনিধি হিসাবে সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকেন ঠিকই কিন্তু প্রশাসনিক কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধির ভূমিকা খুবই নগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বিপুল বোঝা কমানোর জন্য স্বশাসন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার দিশা দিয়েছে।

৩.৮ সাংগঠনিক কাঠামো (Organisational Structure)

সাংগঠনিক কাঠামো কথাটির অর্থ কোনো সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের পারস্পরিক অবস্থান, দায়িত্ব ও ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী পারস্পরিক সম্পর্ক। বহুদিন ধরেই সমাজবিজ্ঞানী এবং ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন ধরন নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। Henry Fayol, Fredrick Taylor, Lyndall Urwick প্রমুখ প্রাচীনপন্থীরা যে Classical design-এর তত্ত্ব উল্লেখ করেছিলেন তাতে পিরামিডের মতো আকৃতির এক hierarchical system দেখা যায় যেখানে কর্তৃত্ব বা নেতৃত্বের ক্ষমতা ক্রমশ সিঁড়ির ধাপের মতো ঊর্ধ্বতন থেকে অধস্তন কর্মীদের দিকে ধাপে ধাপে নেমে আসে। এই জাতীয় কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ক্রমশ উচ্চতর অধিকারিকের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ক্ষমতা সর্বোচ্চ পদাধিকারীর হাতে ন্যস্ত হয়। এর ফলে অধস্তন কর্মীরা কর্তব্য পালন করলেও সবসময় পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে না।

এই ধরনের সিঁড়ির ধাপের মতো সাংগঠনিক কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার যে কাঠামো তার বিরোধিতা করেন কিছু আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী। যেমন, Elton Mayo, Mary Parker Follet, Chester Barnard, Douglas Mcgregor প্রমুখ। এঁরা মনে করেন সিঁড়ির ধাপের মতো ক্রমোচ্চ পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী কাঠামো হতে পারে প্রত্যক্ষভিত্তিক (Organic Structure)। যেখানে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অনুসারে পারস্পরিক সমান্তরাল কর্তৃত্বের কিছু পদ সৃষ্টি করা যায় (যেমন, শরীর সংস্থানে এক একটি প্রত্যঙ্গ নিজের নিজের কাজ সম্পন্ন করে) এবং মূল সংগঠনকে কিছু নির্দিষ্ট বিভাগে

(department) বিভক্ত করে তাদের আলাদা নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা যায়। শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে এই মডেলের সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হল,—

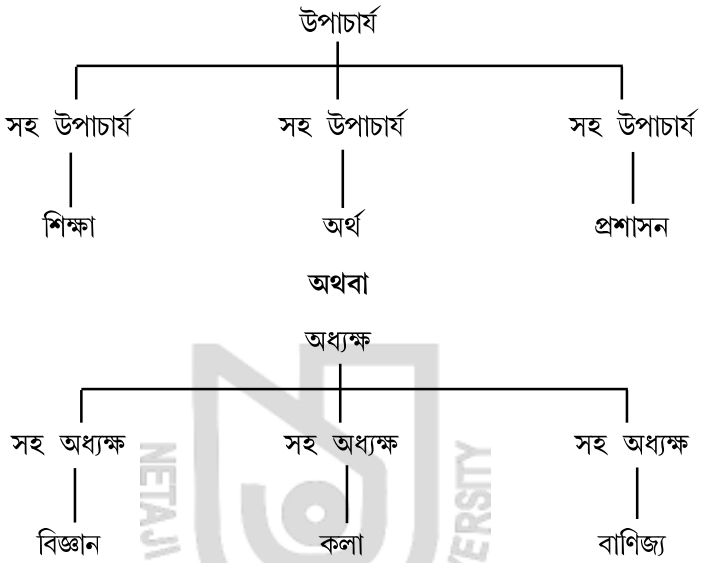

অথবা

এই তত্ত্বের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা যে-কোনো গণতান্ত্রিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। যার ফলে, একদিকে যেমন নেতৃত্বের চাপও কমে আবার অন্যদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে আনা যায়। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ক্রমোচ্চ পর্যায় পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে বেশি প্রথাবদ্ধ বা গতানুগতিক কাঠামো এবং প্রত্যঙ্গভিত্তিক কাঠামো, যার উদাহরণ পরে দেওয়া হয়েছে, তা অপেক্ষাকৃত প্রথামুক্ত এবং আধুনিক। এই কাঠামোর সাহায্যে কর্মীদের দলবদ্ধভাবে কাজের উৎসাহ ও ক্ষমতা বাড়ে, পারস্পরিকভাবের আদানপ্রদানের উন্নতি ঘটে, দলগত দায়িত্বপালন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। শিল্পক্ষেত্রেও দেখা যায় কোনো বড়ো সংস্থা তাদের প্রশাসন অপেক্ষাকৃত সহজে চালানোর জন্য বিভিন্ন ভাইসপ্রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেকের অধীনে একটি করে আলাদা বিভাগ তৈরি করে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে বিভাগীকরণ বা departmentation বলা হয়। যার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যে-কোনো সংস্থার কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই বিভাগীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি নতুন সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি করেছে যা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি আধুনিক।

Departmentation বা বিভাগীকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন প্রকারভেদ অনুসারে সাংগঠনিক কাঠামোর রকমফের হতে পারে। যেমন,—

● **কাজ অনুসারে বিভাগীকরণ** (Departmentation by Function)

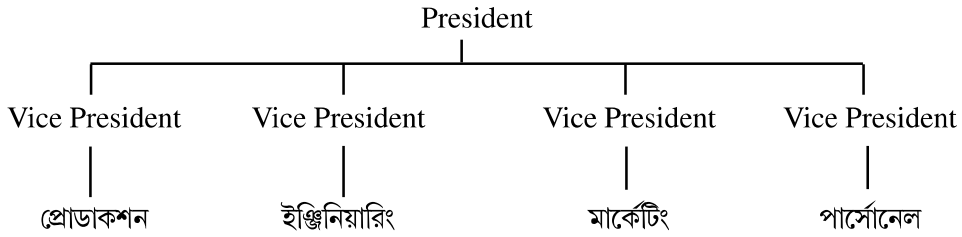

শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

● **উৎপাদিত বস্তু অনুসারে বিভাগীকরণ** (Departmentation by Product)

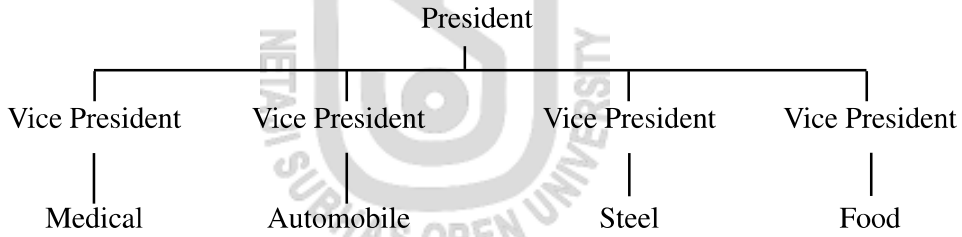

যে সংস্থা বহুমুখী উৎপাদনে নিয়োজিত তার ক্ষেত্রে এই ধরনের বিভাগীকরণ প্রচলিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সংস্থা একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা (General Course), পেশাদারি শিক্ষা (Professional Course) ইত্যাদি পরিচালনা করে। তাদের ক্ষেত্রে এই বিভাগীকরণ প্রযোজ্য।

● **কাজের ক্ষেত্র অনুসারে বিভাগীকরণ** (Departmentation by Area)

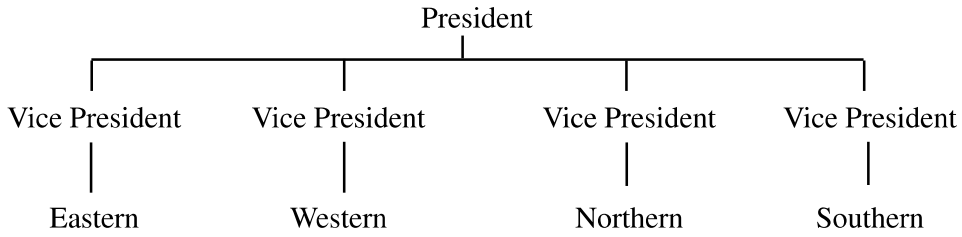

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই জাতীয় আঞ্চলিক বিভাগীকরণের উদাহরণ, NCTE-র দিল্লিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় NCTE-তে আছেন সভাপতি (Chairman) এবং চারজন আঞ্চলিক নির্দেশক (Regional

Director)। এরা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় NCTE-তে গৃহীত নীতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

● **সময় অনুসারে বিভাগীয়করণ** (Departmentation by Time)

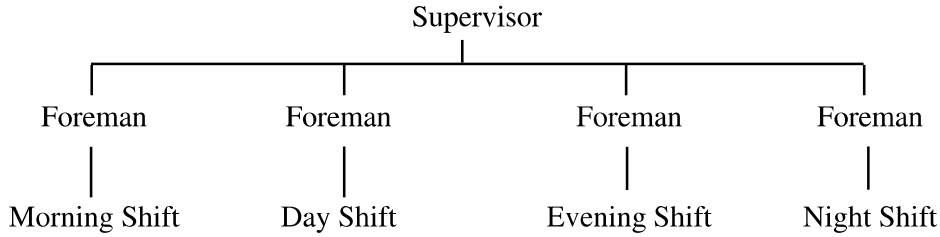

অতীতে অনেক বড়ো বড়ো কলেজে এই জাতীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাতঃবিভাগ, দিবাবিভাগ, সান্ধ্যবিভাগ ইত্যাদির জন্য আলাদা অধ্যক্ষ বা সহ অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হত। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগের আলাদা নাম দেওয়া হলেও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রায়ই একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার (Trust, Society বা অন্যকিছু) হাতে ন্যস্ত।

● বিশেষ কাজ অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করার মাধ্যমে বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টি। যেমন, কোনো বিশেষ task force, commission বা committee ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রদান করা এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ গ্রহণ ও কার্যকর করা। কখনও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ Project Group সৃষ্টি করা হয় এবং নির্দিষ্ট কোনো দক্ষ ব্যক্তির হাতে Project Manager-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিও বহুল প্রচলিত।

প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক কাঠামোর অন্য আর এক ধরনের উদাহরণ হল রৈখিক সংগঠন (Line Organisation)। যেখানে একজন President বা প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্তার অধীনে একাধিক Vice President থাকেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের অধীনে একাধিক General Manager থাকেন। আবার প্রত্যেক General Manager-এর অধীনে একাধিক Works Manager থাকেন। প্রত্যেক Works Manager-এর অধীনে একাধিক Supervisor, আবার প্রত্যেক Supervisor-এর অধীনে একাধিক Foreman এবং প্রত্যেক Foreman-এর অধীনে একাধিক Assistant Foreman থাকেন এবং সবশেষে সাধারণ কর্মীরা থাকেন। এভাবে Line and Staff Orgaisational Structure গঠিত হয়।

ম্যানেজমেন্ট বিষয়টির বিভিন্ন তত্ত্ব প্রধানত শিল্পক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হলেও শিক্ষা প্রশাসনের

ক্ষেত্রে তার বহু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় বলে শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামোতে এই তত্ত্বগুলির বহুল প্রচলন দেখা যায়। যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রৈখিক সংগঠনের উদাহরণ বিশ্ববিদ্যালয়।

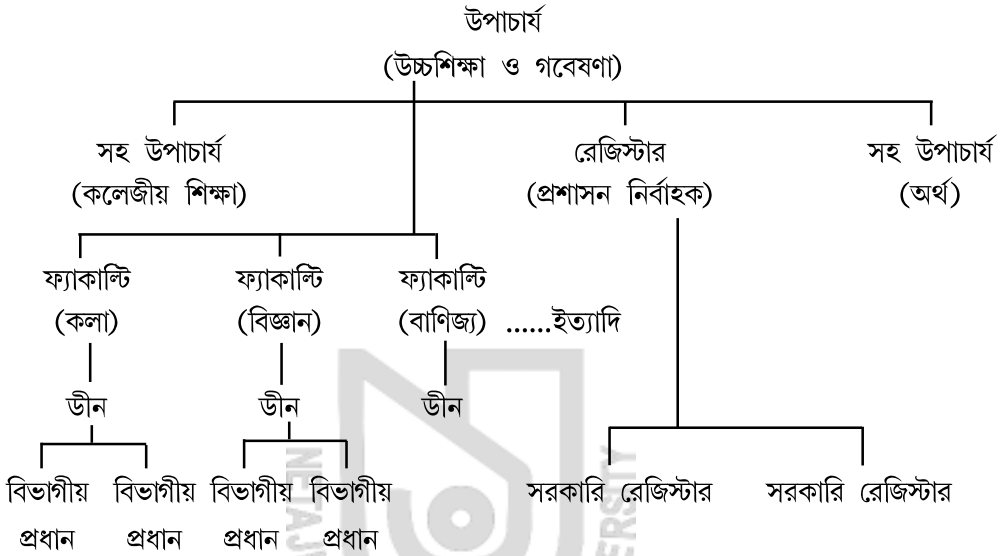

উপরিউক্ত উদাহরণটি একটি ছক বা উদাহরণ মাত্র। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই নীতিই অনুসৃত হয়। প্রকৃত সাংগঠনিক কাঠামো আরও কিছুটা জটিল।

৩.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় কোনো না কোনো সংস্থার মাধ্যমে। যখন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রে একটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠানে একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে কোনো সাধারণ লক্ষ্য অভিমুখে কাজ করে চলে তখন তাকে বলা হয় সংস্থা। সংস্থা ছাড়া মানুষের সামাজিক ও অন্যান্য কাজ অচল। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্থাকে ব্যক্তির সমন্বয় হিসাবে গণ্য করা হয় আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কর্মীদের দায়িত্ব, দক্ষতা ও প্রচেষ্টার মিলিত রূপই সংস্থার প্রাণকেন্দ্র। সংস্থা সক্রিয় থাকে কয়েকটি নীতির ভিত্তিতে। প্রধান নীতিগুলি হল, উদ্দেশ্যের নীতি, সংহতির নীতি, সম্পর্কের নীতি, বোঝাপড়ার নীতি, বিকেন্দ্রীকরণের নীতি, ব্যক্তিগত ভূমিকার নীতি, দায়িত্ব বণ্টন নীতি, কর্মী নির্বাচন নীতি ও নেতৃত্বের নীতি।

নানা সুবিধার জন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। কর্মী নির্বাচনের জন্য সাধারণত তিনপ্রকার কর্মীর প্রয়োজন হয়, অদক্ষ কর্মী, অল্প দক্ষকর্মী এবং দক্ষকর্মী। একজন দক্ষকর্মীর অধীনে কয়েকজন অল্প দক্ষকর্মী। আবার প্রত্যেক অল্প দক্ষকর্মীর অধীনে কয়েকজন অদক্ষ কর্মী নিয়োগ করার ফলে কোনো সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সংখ্যার ভিত্তিতে পিরামিডাকৃতি গঠন দেখা যায়।

সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দরকার কর্তৃত্বের বণ্টন। প্রশাসন বিশেষজ্ঞরা নানা ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন। যেমন, গতানুগতিক প্রাচীনপন্থী কর্তৃত্ব, আইনি কর্তৃত্ব, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কর্তৃত্ব, গ্রহণীয় নেতৃত্ব এবং দক্ষতাভিত্তিক নেতৃত্ব। অধিকাংশ সংস্থা মিশ্র প্রকৃতির কর্তৃত্বের দেখা পাওয়া যায়। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বণ্টনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা তৈরি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রধান সংস্থা বা নেতৃত্বের ওপর চাপ কমে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কর্মীদের দায়িত্ববোধ, উৎসাহ ও দক্ষতা বাড়ানো যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ের নেতৃত্বের ধারা তৈরি হয়ে ওঠে। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ যথাযথ না হলে, দায়িত্ব কর্তব্য স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট না হলে এবং মতবিনিময় ও যোগাযোগের সুবিধা না থাকলে কেন্দ্রীকরণের ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার একটি নীতি হল, প্রতিষ্ঠানের স্বশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভরশীল তাদের শিক্ষাগত স্বশাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্প্রতি দেওয়া শুরু হয়েছে। আবার যেসব সংস্থা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর তারা নিজস্ব পরিচালনা ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করলেও শিক্ষাগতভাবে অর্থাৎ পাঠক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে থাকে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (Central Regulatory Bodies) যেমন, A.I.C.T.E., M.C.I., N.C.T.E. ইত্যাদি, সরাসরি অনুমোদন দেওয়ার নিয়ম বাধ্যতামূলক করার ফলে, দ্বিতীয়প্রকার স্বশাসিত সংস্থার সংখ্যা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে—বিশেষত পেশাদারি শিক্ষার ক্ষেত্রে।

সাংগঠনিক কাঠামো কথাটির অর্থ সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের পরস্পর অবস্থান বা সম্পর্ক। এই জন্য বৃহৎ সংস্থায় প্রয়োজন হয় বিভাগীকরণের। বিভাগীকরণের অনেকগুলি নীতি অনুসৃত হয়। কাজ অনুযায়ী বিভাগ, উৎপাদনভিত্তিক বিভাগ, কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী আঞ্চলিক বিভাগ, সময় অনুযায়ী বিভাগ ইত্যাদি ছাড়াও রৈখিক কাঠামো বৃহৎ সংস্থায় বহুল প্রচলিত। তাত্ত্বিক দিক থেকে ক্রমোচ্চপর্যায়ের পিরামিডাকৃতি গঠন অপেক্ষা বর্তমানে উপরিউক্ত প্রত্যঙ্গাভিত্তিক কাঠামো বেশি প্রচলিত।

শিক্ষাসংস্থা ক্ষেত্রেও প্রায় সমস্ত রকমের কাঠামো ও বিভাগীকরণ প্রচলিত আছে।

৩.১০ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সংস্থা কাকে বলে ?

(খ) সংস্থায় সংহতির নীতি কী ?

(গ) বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মূল কথাটি বিবৃত করুন।

(ঘ) বিভাগীকরণ কাকে বলে ?

(ঙ) কর্তৃত্ব কথাটির অর্থ কী ?

(চ) শিক্ষায় দুটি স্বপরিচালিত সংস্থার নাম লিখুন ও তাদের কাজ উল্লেখ করুন।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) সংস্থার নীতি বলতে কী বোঝায় ? নীতিগুলির নাম লিখুন।

(খ) দক্ষতা অনুযায়ী কর্মীদের দায়িত্বভাগ কীভাবে সম্পন্ন হয় ?

(গ) কর্তৃত্বের কত রকমফের হতে পারে ? কর্তৃত্বের গ্রহণীয়তার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের সুফল কী ?

(ঙ) সাংগঠনিক কাঠামো কাকে বলে ?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) সংস্থা কাকে বলে ? সংস্থার নীতিগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিন।

(খ) কর্তৃত্ব কাকে বলে ? কর্তৃত্ব কতপ্রকার ? কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ কেন প্রয়োজন হয় ? বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

(গ) কোনো প্রতিষ্ঠানের স্বশাসনের পিছনে যুক্তিগুলি কী কী ? এর সুবিধা-অসুবিধা উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

(ঘ) সাংগঠনিক কাঠামো কাকে বলে ? বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করুন।

একক ৪ ❑ শিক্ষায় আর্থিক প্রসঙ্গ (Educational Finance)

গঠন (Structure)

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দের সূত্রপাত

৪.৪ আর্থিক অনুদান

৪.৫ অনুদানের প্রকারভেদ

৪.৫.১ আনুপাতিক অনুদান ব্যবস্থা

৪.৫.২ শ্রেণিভিত্তিক অনুদান

৪.৫.৩ ক্ষতিপূরণ অনুদান

৪.৫.৪ বহুবিধ অনুদান

৪.৬ আর্থিক অনুদানের উৎস

৪.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ

৪.৭.১ সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান

৪.৮ সারসংক্ষেপ

৪.৯ প্রশ্নাবলি

৪.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

যে-কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ অর্থের। শিক্ষা প্রশাসনের অন্যতম বিষয় অর্থের সংস্থান ও সদ্ব্যয় করার প্রক্রিয়া। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা সামাজিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেজন্য বিদ্বান ব্যক্তির ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদানে নিয়োজিত বিদ্বজ্জনের সমস্ত ব্যয়ভারও রাজারা বহন করে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। এমনকি শিক্ষার্থীর ভরণ-পোষণও পরোক্ষভাবে রাজারাই বহন করতেন। কারণ প্রাচীন ভারতেও গুরুগৃহে থেকে শিষ্যরা যখন শিক্ষালাভ করত তখন ভূমি, গোধন ইত্যাদি এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য উপকরণও নিয়মিত দান

করতেন রাজারাই। সাধারণ মানুষের অবদান বলতে ব্রহ্মচর্যকালে ভিক্ষাপ্রার্থী শিষ্যদের দেওয়া ভিক্ষাই একমাত্র উল্লেখ করতে হয়।

মধ্যযুগে ইসলামিক শিক্ষা নবাবি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা ভারতীয় শিক্ষার জন্যও বজায় ছিল। আকবরের মতো উদার সম্রাটরা সমস্তরকম শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গটি ক্রমশ গৌণ হতে শুরু করে এবং শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারি অনুদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। শিক্ষকতা বেতনভুক বৃত্তি হিসাবে গৃহীত হয় সমাজে। সুতরাং শিক্ষা ক্রমশ ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। ছাত্রবেতন প্রথা চালু হলেও তাতে ব্যয়ের সামান্য অংশই পূরণ হয়। শিক্ষা বিস্তারের আর একটি দিক হল উল্লম্ব প্রসার, অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার। এর জন্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন এবং উন্নততর উপকরণ প্রয়োজন। এইসব কিছু শিক্ষার ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি নির্দেশ করে।

বর্তমান এককটিতে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য যে আর্থিক সংস্থান দরকার তার জোগান ও উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি উৎসের প্রসঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রসঙ্গটি শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃত ব্যয়বরাদ্দ ও বণ্টন প্রক্রিয়া শিক্ষার অর্থনীতি (Economics of Education) নামক একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে আলোচিত হয়।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দের সূত্রপাত কীভাবে হল তা সংক্ষেপে বলতে পারবেন।
- অনুদান কাকে বলে এবং অনুদানের প্রকারভেদ করতে পারবেন।
- আর্থিক অনুদানের উৎস সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৩ শিক্ষায় অর্থ বরাদ্দের সূত্রপাত (Beginning of Educational Grants)

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বরাবরই রাজা, জমিদার বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা বজায় ছিল। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত আমরা এই ধরনের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা ব্যক্তিমালিকানার প্রভাব দেখতে পাই। এরপর ক্রমশ সরকারি উদ্যোগে আর্থিক অনুদান আসতে শুরু করে। যদিও তা প্রথমদিকে যথেষ্ট অনিয়মিত ছিল। শিক্ষা জগতের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ আমলে উডের প্রতিবেদনই (Wood's Despatch) সর্বপ্রথম শিক্ষাখাতে নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করার কথা উল্লেখ করে। এর পূর্বে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনে (Charter Act, 1813) ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার কথা বলা হয়। কিন্তু ওই টাকা ভারতীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে না, ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য ব্যয় করা হবে তাই নিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে প্রবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমন্ত্রণে ভারতে এসে মেকলে ইংরাজি শিক্ষার স্বপক্ষে রায় দিলে এই বিতর্কের অবসান ঘটে। কিন্তু এই বরাদ্দকে প্রকৃত অর্থে আর্থিক অনুদান বলা চলে না। অন্যান্য যে-কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল পার্থক্য হল এই যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নির মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়। মূল উদ্দেশ্য হল দেশের মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় আর্থিক অনুদানের বিষয়টি মূলত সরকারি হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই প্রধানত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। ভারতবর্ষের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে শিক্ষাখাতে সরকারি অনুদানের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলেই ধীরে ধীরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমাদের সমাজে দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমান্তরাল বৃদ্ধি ও চাহিদা আমরা লক্ষ করে যাচ্ছি। শিক্ষার মূল লক্ষ্য যদি হয় দেশের সমস্ত মানবসম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন তাহলে রাষ্ট্রকে শিক্ষাখাতে এক বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় যা বাস্তবে সম্ভব না হওয়ার ফলে বেসরকারি পুঁজির প্রবেশ একান্তই অসম্ভব।

৪.৪ আর্থিক অনুদান (Financial Grants)

যখন রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করার জন্য কোনো সংস্থাকে নিয়মিত নির্দিষ্ট

পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে, তখন তাকে বলা হয় অনুদান (Grant)। আর্থিক অনুদান বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যেমন ঃ—

- সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান।
- স্থানীয় আধা সরকারি কর্তৃপক্ষ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
- বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
- কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে স্থাপিত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
- কিছু বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।
- ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠান যে-কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির অর্থে পরিচালিত হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক অনুদান পাওয়ার জন্যে কিছু পরিচালন সংক্রান্ত শর্ত মেনে চলতে হয় এবং উৎকর্ষের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে হয়। বিধিসম্মত ব্যয়সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানগুলির অনুদানের মাত্রা নির্ধারিত হয়। যার মধ্যে পড়ে—

- কর্মচারীদের বেতন।
- গৃহ সংরক্ষণজনিত খরচ বা গৃহনির্মাণ বাবদ খরচ।
- বাড়ি ভাড়া বা ট্যাক্স।
- আসবাবপত্র, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, পুস্তকাদি ইত্যাদির খরচ।
- দৈনন্দিন প্রয়োজনভিত্তিক খরচ (contingency grant)।

৪.৫ অনুদানের প্রকারভেদ (Types of Grants)

এইসব বিধিবদ্ধ ব্যয় সাধারণত সরকারি ক্ষেত্রে চার প্রকারের অনুদান পদ্ধতি থেকেই বহন করতে হয়—

৪.৫.১ আনুপাতিক অনুদান ব্যবস্থা (Matching Grant System)

এই ব্যবস্থায় যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট খরচের একটা অংশ সরকারি সূত্র থেকে পাওয়া গেলেও বাকি অংশ প্রতিষ্ঠানকে নিজেদেরই জোগাড় করে নিতে হয়। আনুপাতিক অনুদানের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সমান সমান ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

৪.৫.২ শ্রেণিভিত্তিক অনুদান (Classwise Grant)

এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় এবং তাদের মান অনুসারে আর্থিক অনুদানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেখা যায় যে এরফলে স্বচ্ছল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশ আরও উন্নত বা স্বচ্ছল হয়ে ওঠে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনুন্নত প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে বলে তারা প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ে। এই সমস্যার কথা মাথায় রাখলে আধুনিক শিক্ষা প্রশাসকদের এই নীতি বর্জন করা উচিত বরং দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণির বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করার উপযোগী অনুদান মঞ্জুর করা উচিত।

৪.৫.৩ ক্ষতিপূরণ অনুদান (Deficit Grant)

কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় এবং যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাজেট অনুসারে সংকুলান করা সম্ভব হয় না, সেই পরিমাণ অর্থ সরকারি সূত্র থেকে পাওয়ার ব্যবস্থাকে ক্ষতিপূরণ অনুদান বলা হয়। যদিও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই অনুদানের আনুপাতিক হার ক্রমশই কমের দিকে যেতে যেতে শেষে প্রায় শূন্যে ঠেকেছে। এই অবস্থায় দুর্বলতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব বহুক্ষেত্রেই সংকটাপন্ন।

৪.৫.৪ বহুবিধ অনুদান (Miscellaneous Grant)

কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থের অনুদানকে এই খাতে ফেলা হয়। এই ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান একটি প্রকার হল এককালীন (Capital Grant) যা গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, কম্পিউটার বা ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম ক্রয় বা লাইব্রেরির বই কেনার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করে যা শিক্ষকদের গবেষণা কাজের ছোটো প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যয় হয়।

৪.৬ আর্থিক অনুদানের উৎস (Source of Financial Grant)

যে-কোনো দেশে আর্থিক অনুদান নির্ভর করে শিক্ষাখাতে গৃহীত কিছু নীতির ওপর ভিত্তি করে। যথা,

- রাষ্ট্রের শিক্ষানীতি এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।

● জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা।

● জনসংখ্যার সমষ্টি ও গড় বৃদ্ধির হার।

● সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব।

● দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান।

● শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান এবং সেই অনুসারে শিক্ষার বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দের নীতি।

আমাদের দেশ ভারতে প্রজাতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালে সংবিধান নির্দেশিত পথে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ভারত সার্বিকভাবে মানবসম্পদ উন্নয়নকে মূলনীতি হিসাবে সামনে রেখে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারিত করে। শিক্ষা বিষয়টির মধ্যে বিভিন্ন উপক্ষেত্র অনুসারে এই ব্যয়বরাদ্দ করা হয় যেমন, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং বৃত্তিগত শিক্ষা। সুতরাং রাষ্ট্রের শিক্ষা বাজেটে শিক্ষার কোন্ খাতে কতটা অর্থব্যয় করলে শিক্ষার উন্নয়নে ভারসাম্য রাখা যাবে তা একটি নীতিগত বিষয় হিসাবে শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা থাকে। যেমন, দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়সি সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা সর্বশিক্ষা অভিযান নামে পরিচিত।

আর্থিক অনুদানের উৎস হিসাবে মূলত আমরা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, জেলা পর্ষদ বা municipality, ধর্মীয় সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিগত দান ও trustee board-এর অনুদানকেই বুঝে থাকি। তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করলে অন্যান্য আর্থিক অনুদানের উৎসের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক প্রসারিত। ১৯৬৪ সালে কোঠারি কমিশন আর্থিক অনুদানের বিষয় কিছু নির্দিষ্ট সুপারিশ করেছিলেন—

● ১৯৬৫-৬৬ সালে জন প্রতি শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল ১২ টাকা এবং ২০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ সালে দ্রব্যমূল্য অপরিবর্তিত থাকলে জন প্রতি ব্যয় করা উচিত ৫৪ টাকা। ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) মাত্র ২·৯% ব্যয় করা হয়েছিল বলে কমিশন সুপারিশ করেছিল যে তা বাড়িয়ে ৬% করা উচিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনুদান তার চেয়ে বাড়াতে পারিনি।

● শিক্ষাস্তরের আনুপাতিক ব্যয় হওয়া উচিত—বিদ্যালয়স্তরে দুই-তৃতীয়াংশ এবং উচ্চশিক্ষায় এক-তৃতীয়াংশ।

● আর্থিক সম্পদের একটা বড়ো অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করতে হবে কারণ রাজস্ব আদায়ের সিংহভাগই কেন্দ্রীয় কোশাগারে জমা পড়ে। তবু রাজ্য সরকার, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং স্থানীয় জনগণ তাদের সামর্থ্য অনুসারে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার মূলত যেসব খাতে আর্থিক অনুদানের সহায়তা করে তা হল—

● অনুমোদিত কলেজগুলিতে

● প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে

● স্নাতকোত্তর শিক্ষায়

● সেন্টার অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ

● রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়

● কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়

● শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ

● উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি দেওয়া

● কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

● বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান

● নবোদয় বিদ্যালয়

● অতি উন্নত কলেজ

● অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ ইত্যাদি।

অতি সম্প্রতি উচ্চশিক্ষায় সম্পূর্ণ **নিজ অর্থ দ্বারা পরিচালিত (self-financed)** উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে যার আর্থিক উৎস হল উচ্চহারে ছাত্রবেতন ও capitation fee থেকে সংগৃহীত অর্থ। কিছু আন্তর্জাতিক শিক্ষাসংস্থা যেমন—UNICEF, UNESCO প্রভৃতি বিদেশি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, রক্ষণাবেক্ষণের

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

উপকরণ বা পুস্তক কিনতে, ছাত্র ও শিক্ষকদের বাসস্থান নির্মাণে, ছাত্রবৃত্তি বা fellowship প্রদানে, গবেষণা বা উচ্চতর অধ্যয়নের অনুদান প্রদানে, পরীক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত কর্মসূচিতে, শতবার্ষিকী উৎসব পালনে, বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ বা কনফারেন্স আয়োজনে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করে থাকে।

রাজ্য সরকারগুলি তাদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের জন্য শিক্ষা উন্নয়ন বা শিক্ষা পরিকল্পনাখাতে কেন্দ্রীয় অনুদানের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে যা বিভিন্ন জেলা পরিষদ, পৌরসভা বা স্থানীয় সংস্থা মারফত Grant-in-aid রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করা হয়।

রাজ্য বাজেটে মূলত তিনটি অংশ থাকে—

(১) পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় (Nonplan expenditure)

- শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন
- দৈনন্দিন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার রাহা বা contingency খরচ
- পরিকাঠামোর প্রতিপালন (maintenance) ব্যয়

(২) পরিকল্পনাখাতে ব্যয় (Plan expenditure)

- নতুন বিদ্যালয়, কলেজ, বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
- নতুন শিক্ষক—অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোর উন্নয়নসাধন
- নতুন পাঠ্যবিষয় বা গবেষণা প্রকল্প চালু করা

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পখাতে ব্যয় (Expenditure on Central Government Project)

- নতুন শিক্ষাপ্রকল্প বা প্রশিক্ষণ
- নারী শিক্ষা, স্বাক্ষরতা প্রকল্প বা সর্বশিক্ষা অভিযান
- বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প
- বিশেষ প্রকল্প যেমন, বিভিন্ন প্রতিবন্ধী উন্নয়ন প্রকল্প

৪.৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ (Privatisation of Educational Institutions)

ভারতের শিক্ষাদান ও শিক্ষা প্রসারের মূল দায়িত্ব বরাবরই সরকারি কর্তৃপক্ষ পালন করে এসেছে। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে পরিচালিত হত। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির প্রবেশ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমান হারে শিক্ষার সুযোগসুবিধা সেভাবে প্রসারিত হয়নি বলেই সরকারি সীমিত সমার্থ্যের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ এখন রমরমিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই বেসরকারিকরণের মূল কারণ হিসেবে জনবিস্ফোরণ, ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা, আর্থিক বৈষম্য ও সামাজিক চাপ তথা কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তাকে দায়ী করা যেতে পারে। সরকার অনুমোদিত অথবা সম্পূর্ণ বেসরকারি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই ব্যক্তিমালিকানায় বা ট্রাস্ট সমিতি বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংগঠনের আওতাধীন। সরকার অনুমোদন দিলেও এইসব ক্ষেত্রে কোনো আর্থিক অনুদান বা পরিচালন ব্যবস্থায় কোনো হস্তক্ষেপ করে না। এইসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত সামাজিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত হলেও তাদের বাণিজ্যিক অভিমুখ অস্বীকার করা যায় না। সমালোচকদের মতে, এরা একধরনের আর্থিক মুনাফা লোটার প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে বহু গণ আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও সরকারি ক্ষেত্রে সুযোগ সম্প্রসারণের অসুবিধে এবং কর্মীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার অভাবই আজ আমাদের ক্রমশ বেসরকারি উদ্যোগের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আমরা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই সমান্তরাল ধারাকে অস্বীকার করতে পারি না। সংবিধান প্রণেতারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ৩০ নং ধারা অনুসারে ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে সীমিত রেখেছিলেন যারা বিশেষ ক্ষমতাবলে সরকারী আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। কোঠারি কমিশনের মতে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারি হাতে থাকা উচিত। বর্তমান সুপ্রিমকোর্টের আদেশে দেখা যায়, কিছু বৃত্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ৫০% পর্যন্ত মেধার ভিত্তিতে ভরতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫০% আসন ম্যানেজমেন্ট কোটার অধীন। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লাভ সুনিশ্চিত করার মধ্যে যে ভারসাম্য রাখা দরকার তা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই হয়ে ওঠে না। সরকারি নিয়মনীতি অনুসারে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনব্যবস্থা সম্পর্কে আরও চিন্তাভাবনার প্রয়োজন।

৪.৭.১ সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান (Government and Nongovernment Institutions)

আগেই বলা হয়েছে যে, পরিকাঠামোগত দিক থেকে ও কর্মীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা অনুসারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকলেও তা কখনোই ছাত্রছাত্রীদের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের পরিচায়ক নয়। তিলক কমিটির (1991) মত অনুসারে—

● বেসরকারিকরণের মূল লক্ষ্য যেখানে আর্থিক লাভ তা কখনোই শিক্ষাগত উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না।

● Self-financed বা শিক্ষার্থীর নিজ খরচে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভরতির ক্ষেত্রে মেধার চেয়েও অর্থবলের ওপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। এরফলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথা মেধাবী এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল শ্রেণির মধ্যে এক শিক্ষাগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

● উচ্চশিক্ষায় সরকারি অনুদানের বা অর্থব্যয়ের ভূমিকা ও পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্যই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্ম এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেকের মতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক কম রাজনৈতিক প্রভাবযুক্ত। যদিও এই মত সর্বাংশে ঠিক নয় কারণ বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ অপেক্ষা একক মতবাদের প্রাধান্য দেখা যায়।

● সরকারি নীতি অনুসারে অনুদানের সিংহভাগ প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয় হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব বেসরকারি হাতেই বেশি করে ন্যস্ত হয়েছে।

● কিছু কিছু ক্ষেত্রে একধরনের মধ্যপন্থাও অবলম্বন করা হয়ে থাকে—যেখানে সরকারি অর্থের অনুদান সত্ত্বেও মূলত বেসরকারি পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি চলে।

● সাধারণভাবে কিছু স্বনির্ভর বা autonomous শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যাতে সরকারি, আর্থিক দায়ভার ও পরিচালনভার কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। বাজার অর্থনীতিতে এইসব স্বনির্ভর বা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আজ আর সম্ভব নয়। তাই আমাদের সমাজে এই দুই-এর মধ্যে এক সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। মোটা টাকার capitation fee, ভরতির দুর্নীতি, উপযুক্ত শিক্ষকের নির্বাচন, স্বচ্ছ পরীক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহু সমালোচনা আছে বলেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও সুপারিশ অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে বলে মনে করা হয়।

৪.৮ সারসংক্ষেপ (Summary)

শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহ করার জন্য এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিপালনের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই নানারকমের আর্থিক সাহায্যের প্রচলন ছিল। প্রধানত রাজারা বা মধ্যযুগের সম্রাটরাও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতেন। ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার দরুন যে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি হয়েছিল তাদের ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারি অনুদানের সুপারিশ প্রথম পাওয়া যায় উডের প্রতিবেদনে। পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অর্থের বরাদ্দ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মূলত সরকার নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সরকার শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেন তাকে বলা হয় আর্থিক অনুদান। আনুপাতিক অনুদান, শ্রেণিভিত্তিক অনুদান, ক্ষতিপূরণ অনুদান, ও বহুবিধ অনুদান এই চারপ্রকার সরকারি অনুদানের প্রথা বর্তমানে প্রচলিত আছে।

আর্থিক অনুদানের প্রধানতম উৎস কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। এ ছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ইত্যাদি শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করে। অনেকসময় এককালীন ব্যক্তিগত দানও শিক্ষার প্রসারে বা উৎকর্ষ সাধনের জন্য পাওয়া যায়। সরকারি অনুদানের নীতি অনেকগুলি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এরমধ্যে অন্যতম হল, জনসাধারণের চাহিদা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি। কোঠারি কমিশন শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহ সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট সুপারিশ করেছেন যার অন্যতম হল কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ। কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সরাসরি অর্থ মঞ্জুর করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন মারফত উচ্চশিক্ষার আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। অনুমোদিত কলেজ, শিক্ষক শিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা, পেশাদারি শিক্ষা, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকারও অনুরূপ ক্ষেত্রে একইভাবে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। সরকারি ব্যয় তিনটি খাতে ভাগ করা হয়। পরিকল্পনাখাতে ব্যয়, পরিকল্পনা বহির্ভূতখাতে ব্যয় এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পখাতে ব্যয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারি আর্থিক সামর্থ্য পাল্লা দিতে না পারায় বর্তমানে ব্যাপকভাবে শিক্ষার বেসরকারিকরণ হচ্ছে। শুধুমাত্র ছাত্র বেতন ও ক্যাপিটেশন ফি-র ভিত্তিতে বহু সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এরফলে শিক্ষা ক্রমশ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল শ্রেণির আয়ত্তে চলে যাচ্ছে।

৪.৯ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষায় অর্থবরাদ্দের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল ?

(খ) আর্থিক অনুদান কাকে বলে ?

(গ) আনুপাতিক অনুদান ব্যবস্থা কী ?

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ কাকে বলে ?

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য ?

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) অনুদানের প্রকারভেদ হয় কেন ?

(খ) শ্রেণিভিত্তিক অনুদান কাকে বলে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(গ) আর্থিক অনুদানের উৎস কী ?

(ঘ) পরিকল্পনাখাতে ব্যয় এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় কথা দুটির অর্থ কী ?

(ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণের কয়েকটি অসুবিধার কথা বলুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) শিক্ষায় আর্থিক অনুদানের প্রকারভেদগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করুন এবং ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উপযুক্ত উদাহরণ দিন।

(খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণের প্রয়োজন কেন ? এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক ৫ ❑ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান (Inspection and Supervision)

গঠন (Structure)

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ধারণা

৫.৩.১ পরিদর্শন ও পরিদর্শক

৫.৩.২ তত্ত্বাবধান

৫.৪ তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলি

৫.৫ আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা

৫.৬ সারসংক্ষেপ

৫.৭ প্রশ্নাবলি

৫.১ প্রস্তাবনা (Introduction)

শিক্ষা প্রশাসনের তাত্ত্বিক ভিত্তি যাই হোক না কেন, অথবা আর্থিক দায়দায়িত্ব যে ভাবেই বণ্টন করা হোক না কেন, তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা কার্যকর করছে তার জন্য একটা নজরদারি তথা সমন্বয় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ, আদেশ নির্দেশ, সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত করার ভার শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের হাতেই ছেড়ে দিলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এখানেই পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব। আবার পরিদর্শনের নামে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে। এইসব কারণে শিক্ষা প্রশাসনের পাঠে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৫.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

● পরিদর্শন ও পরিদর্শক সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দিতে পারবেন এবং পরিদর্শনের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

- তত্ত্বাবধানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলি উল্লেখ করতে পারবেন।
- আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৩ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের ধারণা (Concept of Inspection and Supervision)

পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন। কারণ তত্ত্বাবধানের জন্য পরিদর্শক প্রেরণ ও পরিদর্শন আবশ্যিক। আবার পরিদর্শন শুধুমাত্র ত্রুটি খোঁজার জন্য কখনোই ব্যবহৃত হয় না। ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিকারও পরিদর্শন ব্যবস্থার অংশ। জটিল ও ব্যাপক শিক্ষা প্রশাসনকে সচল রাখার জন্য এই দুই প্রক্রিয়ার ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে তত্ত্বাবধানের ধারণা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। সেজন্য প্রথমে পরিদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করে তারপর তত্ত্বাবধানের বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৫.৩.১ পরিদর্শন ও পরিদর্শক (Inspection and Inspector)

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, আধুনিক ধারণা অনুসারে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান এই দুটি শব্দকে আলাদাভাবে বিচার করা যায় না। কারণ পরিদর্শন মূলত প্রাচীন ধারণা অনুসারে ব্যবহৃত হয় যেখানে কোনো প্রশাসনিক বা রাজস্বসংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা তা দেখাশোনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শকদের মাধ্যমে একধরনের পরিদর্শন ব্যবস্থার প্রয়োজন হত। ব্রিটিশ শাসনকালে শাসকরা তাদের নিজস্ব প্রশাসনিক দায়িত্ব সহজ করার জন্য 'ইনস্পেকটর রাজ' ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। যা স্বাধীনতার এত বছর পরেও পুরোপুরি উঠে যায়নি। এক্ষেত্রে পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাদের সৃষ্টি করা মান অনুযায়ী অধস্তন কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন করা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরিদর্শন কথাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ পরিদর্শন নামক কাজটির ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য খুব একটা বিস্তৃত নয়। পরিদর্শন (Inspection) বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন পরিদর্শক পাঠিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়ন করা বোঝায়, যা অনেক বেশি কৃত্রিম, তাৎক্ষণিক, অগণতান্ত্রিক এবং বাইরে থেকে আরোপিত। পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য কোনো সংস্থার গুণগত ও পরিমাণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াকে বোঝায়, যার দ্বারা রাষ্ট্রীয় বা রাজ্যের

কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মান নীতি ও আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে কিনা তা বিচার করা যায়। গতানুগতিক পদ্ধতিতে এই পরিদর্শন (Inspection) কাজটির মধ্যে একটি কর্তৃত্ব করার মনোভাব লুকিয়ে থাকে। ধরে নেওয়া হয় যে, পরিদর্শকের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে শেষ কথা। ওই প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শকের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকে ফলে পরিদর্শন ব্যবস্থাটির প্রতি একধরনের বিশেষ ভীতি বা সমীহ কাজ করে। অনেকসময় অনেক প্রতিষ্ঠান একধরনের তাৎক্ষণিক কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে পরিদর্শককে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। প্রশাসনিক স্তরে নানা দুর্নীতির সুযোগও এরফলে এসে যায়। যিনি পরিদর্শন করেন তিনি যেহেতু মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল থাকেন না তাই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য, আগ্রহ ও প্রবণতা এবং নিজস্ব চাহিদা তার অজানাই থেকে যায়। প্রশাসনিক কাজের চাপের মধ্যে কর্তৃত্বের মনোভাব ও কড়া নির্দেশাবলির ভীতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক উন্নতি, শিক্ষকদের কাজের স্বাধীনতা এবং শিক্ষামূলক পরীক্ষানিরীক্ষা সবই মূল আলোচনা বা বিবেচনার বাইরে থেকে যায়। ফলে কেবলমাত্র সরকারি স্তরে গৃহীত প্রশাসনিক নিয়মাবলি প্রয়োগের চেষ্টা ছাড়া কোনো উন্নয়নমূলক কাজই এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে না। সরকারি অনুদানের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা দেখাও পরিদর্শন ব্যবস্থার একটি মূল উদ্দেশ্য। এর মূল দায়িত্ব পালন করেন জাতীয়, রাজ্য বা জেলাস্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন সরাকারি আধিকারিকগণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুদান, নিয়ন্ত্রণ এবং আয়ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করা, সংশোধনমূলক নানা নির্দেশনা ইত্যাদি দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নতি করা, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাজের বিষয়ে গঠনমূলক ও সৃষ্টিমূলক নির্দেশ দেওয়া ও নানা সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সাহায্য করা ইত্যাদি পরিদর্শন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলেও সমালোচকরা মনে করেন পরিদর্শন (Inspection) ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি খুঁজে বার করা, প্রশাসনিক নিয়মকানুন অত্যন্ত কড়াভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এবং সর্বোপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সবদিক থেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা। তাই মুদালিয়ার কমিশন পরিদর্শকের বদলে 'শিক্ষা অফিসার' বা 'শিক্ষা পরামর্শদাতা' কথাটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনও পরিদর্শন ব্যবস্থার বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে উল্লেখ করে এর আমূল সংস্কার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। তাঁদের মতে এই ব্যবস্থা একপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পরিকল্পনা অনুসারে হওয়া উচিত

যার দায়িত্বে থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা যাতে তাঁদের পরামর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমাজ-অভিমুখী করে তুলতে সাহায্য করে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে National Assessment and Accredition Council বা NAAC-এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মূলত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী একটি তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই বিষয়ের নেতিবাচক দিকগুলি মাথায় রেখেই সমাজবিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণার ফলে যে উন্নততর সরকারি বা প্রশাসনিক পরিসেবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাকেই বলে তত্ত্বাবধান (supervision)। এই তত্ত্বাবধানের কাজটি পরিদর্শনের তুলনায় অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, উন্নয়নমূলক, মানবিক ও গুণগতভাবে উন্নত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান উন্নত করার ক্ষেত্রে পরিদর্শনের মতো সংকীর্ণ ও নেতিবাচক ব্যবস্থার তুলনায় তত্ত্বাবধান অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

৫.৩.২ তত্ত্বাবধান (Supervision)

আক্ষরিক অর্থে পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য বা কাজের ধরন আরও অনেক পরিমার্জিত, ব্যাপকতর এবং গণতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করেই তত্ত্বাবধান (Supervision) ধারণাটির জন্ম দিয়েছে। আধুনিক শিক্ষাজগতে তাই পরিদর্শনের (Inspection) উন্নততর ধারণা তত্ত্বাবধানই (Supervision) অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য। যে-কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ ও কর্মপরিকল্পনার বিষয়ের তত্ত্বাবধান এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে যার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন ঘটে। তত্ত্বাবধান বা Supervision বিষয়ে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলি বহুল প্রচলিত এবং অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য —

● William. H. Burton এবং Bruckner বলেছেন, —'Supervision is an expert technical service primarily aimed at studying and improving co-operatively all factors which affect child growth and development.' অর্থাৎ, তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশের সমস্ত উপাদানগুলিকে সহযোগিতার মাধ্যমে চর্চা ও উন্নতি করা।

● H. P. Adam এবং F. G. Dickney-এর মতে — 'Supervision is a planned programme for improvement of Institutions'. অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাই হল তত্ত্বাবধান বা Supervision.

● Sam. H. Mooran মনে করেন — 'Supervision is used to describe those activities

which are primarily and directly concerned with studying and improving the conditions which surround the learning and growth of pupils and teachers'. অর্থাৎ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও বিকাশ যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাদের চর্চা ও উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলির সরাসরি বর্ণনা করাই তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য।

● Kimball Wiles এর মতে — 'Supervision is an assistance in the development of a better teaching–learning situation.' অর্থাৎ, তত্ত্বাবধান হল উন্নততর শিখন-শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা।

● C. V. Good বলেন— 'All efforts to designate school officials to direct towards providing leadership to teachers and other educational workers in the improvement of instrument, involves the stimulation of professional growth and development of teacher, the selection and revision of educational objective, materials of instruction, methods of teaching and evaluation of instruction.' অর্থাৎ, শিক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার বিকাশ এবং শিক্ষণের উদ্দেশ্য, উপকরণ, পদ্ধতি ও মূল্যায়নে সঠিক নির্বাচন ও পুনর্মূল্যায়ন প্রধানত তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।

গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোয় এই তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়াটি একটি পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে কাজ করে যার দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা উৎসাহিত বোধ করেন, পঠনপাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন ঘটে। এই গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক পরিসেবার আধুনিক নামই হল তত্ত্বাবধান বা Supervision.

৫.৪ তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলি (Qualities of a Supervisor)

তত্ত্বাবধায়কদের কয়েকটি সাধারণ গুণাবলি এখানে উল্লেখ করা হল।

● গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করার সামর্থ্য।

● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কাজ ও আলোচনার মাধ্যমে সুসম্পর্ক স্থাপন।

● বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর দক্ষতা।

● আন্তরিকতা এবং সমবেদনামূলক মনোভাব।

● দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও উপস্থিত বুদ্ধি।

● গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

● শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত উপাদানগুলি সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান।

● পেশাগত, ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং সততা।

● ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অগ্রিম চিন্তা করার ক্ষমতা।

● প্রশাসনিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে একজন তত্ত্বাবধায়ক (supervisor) বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যার মধ্যে এই সকল গুণাবলির উপযুক্ত সমন্বয় ঘটে।

৫.৫ আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা (Role of Modern Supervisor)

তত্ত্বধায়কের যেসব গুণাবলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রত্যেকটির সঙ্গেই একজন ভালো, দক্ষ তত্ত্বাবধায়কের আদর্শ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবু সুনির্দিষ্টভাবে তত্ত্বাবধায়কের মূল কাজগুলি এখানে উল্লেখ করা হল—

● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নিরূপণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা।

● বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতির মূল্যায়ন করা।

● বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিকতা বিচার করা।

● শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা বিচার করা।

● প্রতিষ্ঠানটির অনুসরণ করার সময়তালিকা (Timetable) কতখানি ত্রুটিমুক্ত তা দেখা।

● অনুসৃত পাঠক্রম কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বিশ্লেষণ করা।

● শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের উন্নতির দিকটি তত্ত্বাবধান করা।

● প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন প্রশাসনিক নথি পরীক্ষা করা এবং আর্থিক অনুদানের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করা।

● শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত চাহিদাপূরণ ও বিকাশসাধন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

● সহপাঠক্রমিক কাজের প্রকৃতি ও গুণগতমান পর্যালোচনা করা।

● প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মীদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করা।

● পাঠক্রমের উন্নয়ন, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিবেশের উন্নয়ন এবং সর্বোপরি শিক্ষণ পদ্ধতির গুণগত মানোন্নয়ন আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের প্রধান ভূমিকার মধ্যে পড়ে।

আধুনিক তত্ত্বাবধায়ক শুধু নিজে পণ্ডিত ব্যক্তি হলেই চলবে না, আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে, তাঁর মনোভাব হবে সহযোগিতামূলক, কাজের নীতি হবে গণতান্ত্রিক এবং সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করলেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উপযুক্তভাবে উন্নতি লাভ করতে পারবে।

৫.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান দুটি অবিচ্ছিন্ন শব্দ হলেও পরিদর্শন অনেকটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিদর্শন বলতে নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অধস্তন কর্মচারীদের কাজের মূল্যায়নকে বোঝায়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কর্তৃত্ব করার মনোভাব এবং ভীতি। পরিদর্শন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার প্রশ্নটিও জড়িত। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে পরিদর্শককে সন্তুষ্ট করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন চিন্তাভাবনা করা এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উন্নয়নের চেষ্টা ব্যাহত হয়। শুধুমাত্র নির্দেশ পালনের প্রবণতা জন্মায়। এই কারণে মুদালিয়ার কমিশন ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশন পরিদর্শন শব্দটি ও পরিদর্শন ব্যবস্থার পরিবর্তন করার সুপারিশ করেছিলেন।

তত্ত্বাবধান তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, সহযোগিতামূলক এবং উদারপ্রক্রিয়া আর সেজন্য অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যও। বিভিন্ন প্রশাসন বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধান কথাটির আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দিয়েছেন। এইসব সংজ্ঞায় তত্ত্ববধান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে, শিক্ষণ ও শিক্ষণের উন্নয়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা, ছাত্রছাত্রীদের বিকাশ ও বৃদ্ধির উপাদানগুলির চর্চা, বর্ণনা ও উন্নতি করা, শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো ইত্যাদি।

এই কারণে তত্ত্বাবধায়ককে শুধুমাত্র তাঁর নিজস্ব বিষয়ে পণ্ডিত হলেই চলে না। শিক্ষার তত্ত্ব, পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। প্রশাসনিক দক্ষতা ছাড়াও, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, সকলের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব, সততা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি বিশেষ গুণগুলি থাকা দরকার। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তত্ত্বাবধায়কদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। শিক্ষার প্রকৃত গুণগত মানোন্নয়ন, পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

৫.৭ প্রশ্নাবলি (Questions)

১। অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) তত্ত্বাবধান কাকে বলে ?

(খ) পরিদর্শন কাকে বলে ?

(গ) আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের যে-কোনো দুটি গুণ উল্লেখ করুন।

২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) পরিদর্শনকে সংকীর্ণ বলা হয়েছে কেন ?

(খ) তত্ত্বাবধানের Kimball Wiles প্রদত্ত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করুন ও ব্যাখ্যা করুন।

(গ) আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের দুটি ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের তুলনামূলক আলোচনা করুন। কোন্ ধারণাটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কেন ?

(খ) তত্ত্বাবধানের সংজ্ঞাগুলি আলোচনা করুন। আধুনিক তত্ত্বাবধায়কের গুণ ও ভূমিকা সম্বন্ধে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

References :

● Chakraborty, Dr. D. K. শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা

● Chakraborti, Dr. P. K., Sengupta, Dr. Madhumala, Nag, Dr. Subir Educational Management

● Chandan. J. S. Management Theory & Practice

● Das. B. C, Sengupta D, Roy. P. শিক্ষায় ব্যবস্থাপনা

● Dennison W. F. & Shenton. Ken Challenges in Educational Management

● Kochhar. S. K. Secondary School Administration

● NCTE : Policy Perspective in Teacher Education

● Pal, Dhar, Das, Banerjee —শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

● Rust, Pitman, Management Guidelines for Teachers

● Rai B. C. School Organisation and Management

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY